POSTAL REG NO GDP- 43 / 2026--2028

আল্লাহ্‌র বাণী

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَآئِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

অনুবাদ:" নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেন, অনুগ্রহ ও সদাচরণ করার নির্দেশ দেন এবং আত্মীয়-স্বজনকে (তাদের প্রাপ্য) দেওয়ারও নির্দেশ দেন। আর তিনি অশ্লীলতা, মন্দ কাজ এবং বিদ্রোহ করতে বারণ করছেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

(সূরা নাহল, ৯১)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

আহমদীয়া সংবাদ

খণ্ড 11

সাপ্তাহিক বদর কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 24

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বাৎসরিক চাঁদা ৬০০ টাকা

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 11 June 2026 25 জুল হজ্জা 1447 A.H

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

হাদীসের আলোকে ন্যায়-বিচার

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, বানু মাখযুম গোত্রের এক মহিলা চুরি করেছিল। এ ঘটনায় কুরাইশরা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ল। তারা চিন্তা করতে লাগল, কে এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে কথা বলতে পারে। অবশেষে তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.)-যিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন-তিনি ছাড়া আর কেউ এ সাহস করতে পারবেন না।

অতঃপর তারা হযরত উসামা (রা.)-কে ওই মহিলার পক্ষে সুপারিশ করার জন্য অনুরোধ করল। যখন হযরত উসামা (রা.) এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে কথা বললেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন-

"তুমি কি আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত শাস্তির ব্যাপারে আমার কাছে সুপারিশ করছ?

এরপর রাসূলুল্লাহ (সা.) দাঁড়ালেন এবং একটি ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন-

"তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল যে, যখন তাদের মধ্যে কোনো সম্মানিত ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি চুরি করত, তখন তারা নানা অজুহাত ও ওজর দেখিয়ে তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন কোনো দুর্বল ও সাধারণ ব্যক্তি চুরি করত, তখন তার ওপর পূর্ণ শাস্তি কার্যকর করত।

আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত, তাহলে আমি অবশ্যই তার হাতও কেটে দিতাম এবং তার ব্যাপারেও কোনো প্রকার শিথিলতা প্রদর্শন করতাম না।"

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হুদুদ, অধ্যায়: চোরের হাত কাটা-সে সম্ভ্রান্ত হোক বা অন্য কেউ)

মনে রাখবেন!

হযরত আমীরুল মুমিনীন, খলিফাতুল মসীহ (আইয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আযীয)-এর জুমার খুতবা ১ এপ্রিল ২০২৬ থেকে সন্ধ্যা ৫টা ৩০ মিনিটে সম্প্রচারিত হচ্ছে।

জামাতের সদস্যবৃন্দকে অনুরোধ করা যাচ্ছে, তাঁরা যেন এই সময়সূচি অনুযায়ী হুযূর আনওয়ারের জুমার খুতবা শোনা এবং অন্যদের শোনানোর যথাযথ ব্যবস্থা করেন।

সম্পাদকমণ্ডলী

ইসলামে ন্যায়-বিচার ও অনুগ্রহের গুরুত্ব

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণী

আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দেন: 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেন, আর উত্তম আচরণ করার এবং আত্মীয়-স্বজনকে দেওয়ারও নির্দেশ দেন।"

(সূরা আন-নাহল, ১৬:৯১)*

জেনে রাখা উচিত যে, ইনজিলের শিক্ষা সেই পূর্ণতার স্তরে পৌঁছায় না, যেখান থেকে বিশ্বজগতের ব্যবস্থা তার সামঞ্জস্য ও শক্তি লাভ করে। এই শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ বলে মনে করাও একটি গুরুতর ভ্রান্তি। এমন শিক্ষা কখনোই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না।

(বরাহীন-এ-আহমদিয়া, ৪র্থ খণ্ড, রূহানী খাযাইন, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪২৬-৪২৭, টীকা নং ৩)

আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দেন যে, তোমরা তাঁর সঙ্গে এবং তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে ন্যায়বিচার (আদল)-এর ভিত্তিতে আচরণ করো। অর্থাৎ আল্লাহর হক এবং তাঁর বান্দাদের হক যথাযথভাবে আদায় করো।

আর যদি তোমরা এর চেয়েও উচ্চতর স্তরে উন্নীত হতে পারো, তাহলে ন্যায়বিচারের সীমা অতিক্রম করে ইহসান অবলম্বন করো। অর্থাৎ কেবল কর্তব্য পালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে আরও অধিক আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে আল্লাহর ইবাদত করো-এমনভাবে যেন তোমরা তাঁকে দেখছ।

এবং মানুষের সঙ্গেও তাদের প্রাপ্য অধিকারের চেয়েও বেশি সদাচার, অনুগ্রহ ও উত্তম ব্যবহার করো।

আর যদি তোমরা এরও ঊর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হও, তাহলে আল্লাহর ইবাদত এবং তাঁর সৃষ্টির সেবা এমন নিঃস্বার্থ ও স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসার সঙ্গে করো, যেমন মানুষ তার নিকটাত্মীয়দের প্রতি স্বাভাবিক স্নেহবশত করে থাকে।

(শাহনা-এ-হক, রূহানী খাযাইন, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৬১-৩৬২)

ন্যায়-বিচার, অনুগ্রহ ও সদাচার এবং আত্মীয়-স্বজনের প্রতি ন্যায় স্নেহ ও সহানুভূতি প্রদর্শনের ইসলামী শিক্ষা

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতার, অনুগ্রহ করার এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন; আর অশ্লীলতা, প্রকাশ্য মন্দ কাজ এবং সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।" (সূরা আন-নাহল, ১৬:৯১)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন-: এই আয়াতে তিনটি কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তিনটি কাজ থেকে বিরত থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে। মন্দ বিষয়গুলো থেকে নিষেধ করা আল্লাহর রহমতের পরিচায়ক এবং উত্তম বিষয়গুলোর আদেশ দেওয়া তাঁর হিদায়াতের পরিচায়ক।

এই আয়াত পবিত্র কুরআনের সর্বাঙ্গীনতার সর্বোত্তম উদাহরণ। তদুপরি, নৈতিকতার সকল স্তরকে এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ কারণেই এই আয়াত এত ব্যাপক হয়েছে এবং কুরআন যে "তিবইয়ানাল্লি কুল্লি শাই' (সকল বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা), তার এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে: "লাআল্লাকুম তাযাক্কারূন'তাযাক্কারা শব্দের অর্থ যাক্কারা-এরই অনুরূপ, যার অর্থ হলো "স্মরণ করা"অথবা "আল্লাহর মহিমা ও প্রশংসা বর্ণনা করা"।

অতএব "লাআল্লাকুম তাযাক্কারূন-এর অর্থ হলো:

"যেন তোমরা আল্লাহর হক এবং তাঁর বান্দাদের হক স্মরণ রাখো, অথবা, "যেন তোমরা আল্লাহর মহিমা ও প্রশংসা বর্ণনা করো।"

আর যেহেতু এই দুটি উদ্দেশ্যই মানুষের সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য, তাই এই আয়াত সুসংবাদও প্রদান করছে যে, যদি তোমরা এই শিক্ষার ওপর আমল কর, তবে তোমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করতে সক্ষম হবে।

লক্ষ্য করো, আয়াতটি কত সংক্ষিপ্ত, অথচ কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে যে দাবি করা হয়, তার সঙ্গে সম্পর্কিত সব বিষয়ের ওপর কী চমৎকারভাবে আলোকপাত করেছে। এত সংক্ষিপ্ততার মধ্যে এত বিশদ আলোচনা পবিত্র কুরআন ব্যতীত অন্য কোনো গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

তদুপরি, এতে কোনো অস্পষ্টতা নেই, কোনো ধাঁধাও নেই। বিষয়বস্তু একেবারে স্পষ্ট। সামান্য চিন্তাভাবনা করলেই যে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি এর প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে পারে।

এখন আমি এই আয়াতের বিষয়বস্তু কিছুটা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করব।

স্মরণ রাখা উচিত যে, পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুর একটি ইতিবাচক দিক এবং একটি নেতিবাচক দিক রয়েছে। কোনো কিছু তখনই পূর্ণতা লাভ করে, যখন এই উভয় দিকই পূর্ণ হয়। অর্থাৎ তার পূর্ণতার জন্য যা যা প্রয়োজন, সেগুলো তার মধ্যে থাকতে হবে এবং যেসব বিষয় তার মধ্যে ত্রুটি সৃষ্টি করে, সেগুলো থেকে তা মুক্ত থাকতে হবে।

একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মীয় শিক্ষার মধ্যে, ধর্মের প্রকৃতি বিবেচনায়, নিম্নোক্ত তিনটি গুণ থাকা অপরিহার্য-

প্রথমত:এটি এমন বিষয়ের আদেশ দেবে, যা আত্মাকে তার পূর্ণতা অর্জনে সাহায্য করে এবং এমন বিষয় থেকে নিষেধ করবে, যা তাকে সেই পূর্ণতা থেকে বঞ্চিত করে।

এরপর ৮ পাতায়...

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

১৬ই মে, ২০২৬ জামাত আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের পক্ষ থেকে আয়োজিত ১৯তম পিস সিম্পোজিয়াম-এ
সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণের প্রভাব

আহমদিয়া শান্তি পুরস্কার প্রদান

আফ্রিকার বেনিনের জনাব গ্রেগোয়ার আহংবোনোঁ-কে আহমদিয়া শান্তি পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। পশ্চিম আফ্রিকায় মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের পরিচর্যা ব্যবস্থার উন্নয়নে তাঁর বৈপ্লবিক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। এ উপলক্ষে তাঁর কাজের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত প্রামাণ্যচিত্রও প্রদর্শন করা হয়।

পরবর্তীতে হযরত আমীরুল মুমিনীন, খলিফাতুল মসীহ পঞ্চম (আই.)-এর মুবারক হাত থেকে তিনি পুরস্কার ও দশ হাজার পাউন্ডের একটি চেক গ্রহণ করেন।

এরপর তিনি মঞ্চে এসে ফরাসি ভাষায় উপস্থিত শ্রোতাদের উদ্দেশে বক্তব্য প্রদান করেন, যা একই সঙ্গে সাবলীল ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়। তিনি এই পুরস্কার লাভের জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং পশ্চিম আফ্রিকায় মানসিক স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন। বক্তব্যের শেষে তিনি হযরত আমীরুল মুমিনীন এবং আহমদিয়া মুসলিম জামাআতের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

স্বাগত বক্তব্য ও বিশিষ্ট অতিথিদের সংক্ষিপ্ত ভাষণ

হযরত আমীরুল মুমিনীনের (আল্লাহ তাঁর সাহায্য দ্বারা তাঁকে শক্তিশালী করুন) ভাষণের পূর্বে সম্মানিত আমীর সাহেব ইউকে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। এছাড়াও কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। এর বিবরণ নিম্নরূপ:

সম্মানিত রফিক আহমদ হায়াত সাহেবের স্বাগত বক্তব্য

(আমীর, জামাআতে আহমদিয়া যুক্তরাজ্য)

সকলকে স্বাগত জানানোর পর সম্মানিত আমীর সাহেব বলেন যে, আজ সমাজের বিভিন্ন স্তর এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা এখানে সমবেত হয়েছেন। যদি আমরা পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাই, তাহলে আমাদের সবাইকে একযোগে ঐক্য, সম্প্রীতি এবং পারস্পরিক সম্মান বৃদ্ধির জন্য কাজ করতে হবে।

তিনি বলেন, বর্তমানে বিশ্ব একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও বিপজ্জনক সময় অতিক্রম করছে। পৃথিবীর বহু অঞ্চলে অস্থিরতা ও সংঘাত বিরাজ করছে। শিশুরা প্রাণ হারাচ্ছে এবং বিভিন্ন জাতি পরস্পরের সঙ্গে মতবিরোধ ও সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ছে।

তিনি উল্লেখ করেন যে, হযরত খলিফাতুল মসীহ শান্তি ও ন্যায়বিচারের বিষয় নিয়ে বিশ্বের বহু গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চে ভাষণ প্রদান করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট, ইউরোপীয় পার্লামেন্ট, ওয়াশিংটন ডিসির ক্যাপিটল হিল, কানাডিয়ান পার্লামেন্ট, ডাচ পার্লামেন্ট এবং নিউজিল্যান্ড পার্লামেন্ট।

একইভাবে, হযরত আমীরুল মুমিনীন বিশ্বনেতাদের কাছেও ব্যক্তিগত চিঠি লিখে তাদেরকে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছেন, যাতে বিশ্ব আরও ধ্বংসের দিকে অগ্রসর না হয়। তিনি বলেন, এই বিপজ্জনক সময়ে যখন অনিশ্চয়তা ও ভীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন হযরত আমীরুল মুমিনীনের শান্তি, সম্প্রীতি ও ন্যায়বিচারের বার্তা আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি।

তিনি আরও বলেন: "ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ! ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয়-এবং হযরত আমীরুল মুমিনীন বারবার আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন-যে স্থায়ী শান্তি কখনো শক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় না। প্রকৃত ও দীর্ঘস্থায়ী শান্তি কেবল ন্যায়বিচার, সততা এবং পারস্পরিক সম্মানের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে।

যদি আমরা একটি শান্তিপূর্ণ বিশ্ব দেখতে চাই, তাহলে সকল মানুষ এবং সকল জাতির জন্য সমানভাবে ন্যায়বিচার বাস্তবায়ন করতে হবে।"

পরিশেষে তিনি দোয়া করেন:

"আল্লাহ তাআলা যেন মানবজাতিকে শান্তি, ন্যায়বিচার এবং পুনর্মিলনের পথে পরিচালিত করেন। আমীন।"

গ্রেগ স্ট্যাফোর্ড এমপি

(ফার্নহাম ও বর্ডনের সংসদ সদস্য)

তিনি বলেন: "ন্যাশনাল পিস সিম্পোজিয়ামে আপনাদের সঙ্গে যোগ দিতে পেরে এবং যুক্তরাজ্য ও বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত অতিথিদের আমার নির্বাচনী এলাকায় স্বাগত জানাতে পেরে আমি আনন্দিত।

এ বছরের সিম্পোজিয়ামের প্রতিপাদ্য, 'নিখুঁত বৈশ্বিক ন্যায়বিচার: প্রকৃত শান্তির ভিত্তি'-বর্তমান সময়ের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এমন এক সময়ে যখন বিশ্ব আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় অধিক বিভক্ত, অনিশ্চিত এবং উদ্বিগ্ন বলে মনে হচ্ছে, তখন এ ধরনের সমাবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।"

তিনি আরও বলেন: "একজন স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং আহমদিয়া মুসলমানদের জন্য অল-পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপের সেক্রেটারি হিসেবে আমি এই জামাআতের অসাধারণ সেবামূলক কর্মকাণ্ড খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি, বিশেষত স্থানীয় পর্যায়ে।

যে বিষয়টি আমাকে সবসময় মুগ্ধ করে তা হলো, এখানে শান্তিকে কেবল একটি আদর্শিক ধারণা বা স্লোগান হিসেবে দেখা হয় না; বরং তা বাস্তবে অনুশীলন করা হয়। সেবা, দানশীলতা এবং মানুষকে একত্রিত করার মাধ্যমে এই জামাআত শান্তির প্রসারে কাজ করে।"

তিনি আরও বলেন যে, শান্তির প্রকৃত ভিত্তি নিহিত রয়েছে আমাদের দৈনন্দিন পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে। যদি আমরা নিজেদের স্থানীয় সমাজে শান্তি বজায় রাখতে না পারি, তাহলে বৈশ্বিক শান্তির জন্য আমাদের প্রচেষ্টা অনেকটাই অর্থহীন হয়ে পড়ে। তিনি বলেন: "টেকসই শান্তি কেবল একে অপরকে সহ্য করার মাধ্যমে আসে না; বরং ধারাবাহিক সম্পর্ক এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে তা বিকশিত হয়।" তিনি বিশেষভাবে হযরত আমীরুল মুমিনীনের কথা উল্লেখ করে বলেন: "শান্তি, ন্যায়বিচার এবং পারস্পরিক সম্মানের বিষয়ে তাঁর ধারাবাহিক বার্তা শুধু এই জামাআতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা সমগ্র বিশ্বের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।"

রাইট অনারেবল স্যার এড ডেভি এমপি

তিনি বলেন: "আরেকটি শান্তি সিম্পোজিয়ামে আমন্ত্রিত হতে পেরে আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি। আমি সকল অতিথিকে ধন্যবাদ জানাই।

আমার দেশের মধ্যে এমন আর কোনো সম্প্রদায়ের কথা আমি জানি না, যারা এত ধারাবাহিকভাবে ও দৃঢ়তার সঙ্গে শান্তির পক্ষে আওয়াজ তোলে এবং বিভিন্ন ধর্মের মানুষ-এমনকি যারা কোনো ধর্মে বিশ্বাসী নন-তাদেরও একত্রিত করে সংলাপের সুযোগ সৃষ্টি করে।

এটি আমাদের নিজেদের দেশের শান্তির জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি বিভিন্ন দেশের মধ্যকার শান্তির জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।"

তিনি আরও বলেন: "হযরত আমীরুল মুমিনীন একজন বিশ্বনেতা, যিনি শান্তির গুরুত্বের ওপর সবচেয়ে জোরালোভাবে গুরুত্বারোপ করেন।"

ফেলথাম ও হেস্টনের সংসদ সদস্য

সম্মানিত মহিলা বলেন যে, সংঘাত প্রতিরোধ এবং আরও সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সামাজিক সংগঠন, ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং নাগরিক নেতারা মানুষ ও সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া বৃদ্ধি এবং একে অপরের নিকটবর্তী করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

তিনি বলেন: "এই কারণেই আমি আহমদিয়া মুসলিম জামাআতের সেবাসমূহ এবং হযরত আমীরুল মুমিনীনের নেতৃত্বকে অত্যন্ত মূল্যায়ন করি, যা আমি গত কয়েক বছর ধরে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। শান্তি, ন্যায়বিচার এবং মানবিক মর্যাদার পক্ষে আপনাদের ধারাবাহিক কণ্ঠস্বর বিশ্বব্যাপী মানুষের হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে।"

তিনি আরও বলেন: "আমরা ইউক্রেন ও গাজায় যুদ্ধের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করেছি। আমরা ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা দেখেছি এবং সম্প্রতি ইরানকে ঘিরে সংঘাতও দেখেছি। আমরা কখনোই এবং কোনো অবস্থাতেই যুদ্ধকে আমাদের প্রজন্মের পরিচয়চিহ্নে পরিণত হতে দিতে পারি না। বরং আমাদের উত্তরাধিকার হওয়া উচিত শান্তির উত্তরাধিকার।"

শেষে তিনি বলেন: "আজকের অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং মানবতার সেবা ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আপনাদের সকল প্রচেষ্টার জন্য আবারও ধন্যবাদ। আপনাদের সঙ্গে এই সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি। ধন্যবাদ।"

শান্তি সিম্পোজিয়াম ও হযরত খলিফাতুল মসীহের ভাষণ সম্পর্কে বিশিষ্ট অতিথিদের অভিমত

নিচে শান্তি সিম্পোজিয়াম সম্পর্কে এবং হযরত খলিফাতুল মসীহের ভাষণ উপলক্ষে প্রশাসনের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন বিশিষ্ট অতিথির অভিমত তুলে ধরা হলো।

সম্মানিত রফিক আহমদ হায়াত সাহেব
আমীর, জামাআতে আহমদিয়া যুক্তরাজ্য

অনুষ্ঠান শেষে 'আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল'-এর প্রতিনিধিকে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে সম্মানিত আমীর সাহেব বলেন যে, বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধ ও রক্তপাত অব্যাহত রয়েছে, যার ফলে মানুষ চরম উদ্বেগ ও কষ্টের মধ্যে রয়েছে। বিশেষ করে গাজা, লেবানন, সুদান এবং আফগানিস্তানের মতো এলাকায় পরিস্থিতি অত্যন্ত শোচনীয়।

তিনি বলেন: "বহু বছরের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যুদ্ধ কোনো প্রকৃত কল্যাণ বয়ে আনেনি; বরং তা শুধু ক্ষতি ও ধ্বংস ডেকে এনেছে।"

আমীর সাহেব আরও বলেন: "যদি বিশ্বনেতারা নিজেদের অহংকার পরিত্যাগ করে হযরত খলিফাতুল মসীহ (আল্লাহ তাঁর সাহায্য দ্বারা তাঁকে শক্তিশালী করুন)-এর প্রদত্ত নির্দেশনা এবং শান্তি ও মানবতার বার্তার প্রতি মনোযোগ দেন, তাহলে পৃথিবীতে আরও ভালো শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।"

তিনি উল্লেখ করেন যে, কিছু বিশ্বনেতা কেবল যুদ্ধের জন্য আর্থিক বা রাজনৈতিক

(শেষাংশ ১২ পাতায়....)

জুমআর খুতবা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যবাদিতা ও আমানতদারির অনুপ্রেরণামূলক আলোচনা

লক্ষ্য করুন, আমাদের নেতা ও প্রভু হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) মক্কায় এমন অবস্থায় আবির্ভূত হয়েছিলেন, যখন বাহ্যিক দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল। সে সময় আবু জাহল ও অন্যান্য অবিশ্বাসীরা ক্ষমতার চূড়ায় অবস্থান করছিল এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ঘোরতর শত্রুতে পরিণত হয়েছিল।

তাহলে কোন জিনিসটি শেষ পর্যন্ত আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-কে বিজয় ও সাফল্য দান করেছিল?

এ কথা ভালোভাবে বুঝে নিন-তা ছিল তাঁর সত্যবাদিতা, আন্তরিকতা, হৃদয়ের পবিত্রতা এবং আমানতদারি। (হযরত মসীহ মওউদ (আ.)

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনচরিতের ঘটনাবলিতে আমরা তাঁর সত্যবাদিতার সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। এমনকি তাঁর শত্রুরাও তাঁর সততা ও বিশ্বস্ততার উচ্চ মান স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল।

আজ আমাদের প্রত্যেকেরই এ বিষয়ে আত্মসমালোচনা করা প্রয়োজন। কারণ সত্যবাদিতার এই উচ্চ মানই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সাফল্যের নিশ্চয়তা দেয় এবং তাবলিগের দরজাগুলো আমাদের জন্য উন্মুক্ত করে।

"আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.) সম্পর্কে দেখি যে, তাঁর শত্রুরাও স্বীকার করত তিনি 'সাদিক' (সত্যবাদী) এবং 'আমীন' (বিশ্বস্ত)। তারা কখনো তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যার অভিযোগ আনেনি। বরং একের পর এক শত্রুও তাঁর পবিত্রতা ও নির্মলতার সাক্ষ্য দিয়েছে।" হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)

"তোমাদের ওপর সত্যবাদিতা অবলম্বন করা আবশ্যক। কারণ সত্য মানুষকে নেকীর দিকে নিয়ে যায়, আর নেকী জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি যখন সর্বদা সত্য কথা বলে এবং সত্যের অনুসরণে অবিচল থাকে, তখন আল্লাহর নিকট তাকে 'সিদ্দীক' (মহাসত্যবাদী) হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়।

› মিথ্যা থেকে সাবধান! কারণ মিথ্যা মানুষকে পাপাচারের দিকে নিয়ে যায়, আর পাপাচার জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি যখন বারবার মিথ্যা বলে এবং মিথ্যার অনুসরণে লিপ্ত থাকে, তখন আল্লাহর নিকট তাকে 'কাযযাব' (মহামিথ্যাবাদী) হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়। আর যখন তাকে কাযযাব হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়, তখন সে জাহান্নামের দিকেই অগ্রসর হতে থাকে।"

হযরত আবু বকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলেছিলেন-

"আল্লাহর কসম! আমি কখনো আপনাকে মিথ্যা বলতে দেখিনি। আপনার আমানতদারি, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা এবং উত্তম চরিত্রের কারণেই আপনি নবুয়তের সর্বাধিক যোগ্য। আপনার হাত প্রসারিত করুন, আমি আপনার হাতে বায়আত করতে চাই।"

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন-

"আবু জাহলের মতো চরম বিরোধী ও কঠোর হৃদয়ের মানুষও আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-কে মিথ্যাবাদী বলতে প্রস্তুত ছিল না। যেন তার বিবেক তাকে ধিক্কার দিত এবং তার হৃদয় কেঁপে উঠত-'আমি কী ভয়ংকর কাজ করছি!'

তাই সে এই অজুহাত দিত, 'আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষাকে অস্বীকার করছি, তাঁকে মিথ্যাবাদী বলছি না।

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১৭ এপ্রিল , ২০২৬, এর জুমুআর খুতবা (১৭ আমান, ১৪০৫ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় পাঠ করেন,

قُلْ لَّوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَدْرٰىكُمْ بِهٖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ. فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ.

এই আয়াতগুলোর অনুবাদ হলো, "আর তুমি তাদেরকে বলো, 'আল্লাহ্ যদি চাইতেন তাহলে আমি তা তোমাদের কাছে পড়ে শোনাতাম না এবং তিনিও এই শিক্ষা সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করতেন না। নিশ্চয় এর পূর্বে আমি তোমাদের মাঝে এক দীর্ঘ জীবন কাটিয়েছি; তবুও কি তোমরা বিবেকবুদ্ধি খাটাবে না? অতএব, যে আল্লাহ্র নামে মিথ্যা রটনা করে অথবা তাঁর নিদর্শনাবলিকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করে তার চেয়ে প্রকাশ্য ন্যায়বিচার লঙ্ঘনকারী আর কে হতে পারে? বাস্তব সত্য হলো, অপরাধীরা কখনো সফল হয় না।" (সূরা ইউনুস: ১৭-১৮)

মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জীবনচরিতের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা চলছে। আজ তাঁর (সা.) সত্যবাদিতা, সততা ও ন্যায়পরায়ণতার গুণাবলি সম্পর্কে আলোচনা হবে। তাঁর (সা.) জীবনচরিতের ঘটনাবলির মাঝে তাঁর (সা.) সত্যবাদিতার এমন সব উন্নতমানের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে, শত্রুরাও তাঁর (সা.) সত্যবাদিতা ও সততার সুউচ্চ মানকে স্বীকার না করে থাকতে পারে না।

তাঁর (সা.) সত্যবাদিতার এই মানদণ্ডটিই আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন, যা আমি পাঠ করেছি। আর তিনি তাঁকে দিয়ে এই ঘোষণা করিয়েছেন যে, 'তাদের বলে দাও, আমি কখনো কোনো অবস্থায়ই মিথ্যা বলিনি, সত্যের আঁচল কখনো পরিত্যাগ করিনি এবং তোমরা এর সাক্ষী আছো; তাহলে আমি কি খোদা তা'লার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ ক রে বলবো, এমন এক ধর্ম নিয়ে এসেছি যা খোদার পক্ষ থেকে নয়?' এটি কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। আর এর পাশাপাশি তিনি (সা.) তাঁর অনুসারীদেরকেও এই উপদেশ প্রদান করেছেন যে, তোমরা যেহেতু এখন আমার আনুগত্য বরণ করেছো, আমাকেঅনুসরণের অঙ্গীকার করেছো, তাই সত্যবাদিতার সুউচ্চ মান প্রতিষ্ঠা করো।

অতএব, আজ আমাদের সবাইকে এ বিষয়ে আত্মবিশ্লেষণ করা প্রয়োজন যে, সত্যবাদিতার এই সর্বোচ্চ মান দণ্ডই আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সাফল্যের চাবিকাঠি এবং আমাদের জন্য তবলীগের পথ উন্মোচনকারী।

মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জীবনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক স্থানে লিখেছেন বা খুতবায় বলেছেন,

'আমরা মহানবী (সা.) জীবনীতে দেখতে পাই, তাঁর (সা.) শত্রুরাও স্বীকার করেছে যে, তিনি (সা.) সাদিক (তথা সত্যবাদী) এবং আমীন (তথা বিশ্বস্ত) ছিলেন এবং তারা তাঁর (সা.) চরিত্রে কোনো অপবাদ আরোপ করেনি; বরং চরম শত্রুরাও তাঁর (সা.) পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতার সাক্ষ্য প্রদান করেছে।

যেমন, বহিরাগতরা যখন মক্কায় এলে যখন তারা মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, তখন তাদেরকে কী উত্তর দেওয়া হবে- এই নিয়ে মক্কায় একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তারা বলে, সবাই মিলে একটি (নির্দিষ্ট) উত্তর ঠিক করে নাও, যেন কোনো মতবিরোধ না হয়। এমনিতেই আমরা দুর্নামের শিকার হচ্ছি যে, একজন এক কথা বলে তো অন্যজন আরেক কথা বলে।

তাই হজ্জের সময় যেসব লোক আসবে, তাদেরকে বলার জন্য একটি বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো। এর প্রেক্ষিতে তাদের মধ্য থেকে একজন বলে, এ কথা বলে দিও যে, (তাঁর) মিথ্যা বলার অভ্যাস রয়েছে, যা কিছু বলে তার সবই মিথ্যা। এ কথা শুনে নযর বিন হারিস নামের একজন দণ্ডায়মান হয় এবং বলে, একথা বলা সমীচীন হবে না। যদি এ কথা বলো, তবে কেউ তা বিশ্বাস করবে না বরং লোকেরা উত্তরে বলবে, মুহাম্মদ (সা.) তো তোমাদের মাঝেই তাঁর যৌবনকাল অতিবাহিত করেছেন। আর তখন তিনি তোমাদের মাঝে সর্বাধিক সৎকর্মশীল বিবেচিত হতেন, সবচেয়ে বেশি সত্যবাদী বলে গণ্য হতেন এবং সবচেয়ে বেশি আমানতদার বা বিশ্বস্ত ছিলেন; এমতাবস্থায় যখন তাঁর কানের পাশের চুলগুলি সাদা হয়ে গেছে এবং তিনি তোমাদের কাছে সেই শিক্ষা নিয়ে এসেছেন– অর্থাৎ ইসলামের শিক্ষা; তখন তোমরা বলতে আরম্ভ করলে– তিনি মিথ্যাবাদী। খোদার কসম! এমন পরিস্থিতিতে তিনি কখনো মিথ্যাবাদী হতে পারেন না।

কাজেই, ঐ ব্যক্তির এই উত্তরের পর সবাই নিজেদের ভুল স্বীকার করে নেয় এবং এই আপত্তির পরিবর্তে অন্য কোনো কথা ভাবতে আরম্ভ করে। লোকটি কত সত্য কথাই না উপস্থাপন করেছিল! যদি ইতিপূর্বে তারা কখনো মহানবী (সা.)-এর প্রতি মিথ্যার অপবাদ আরোপ করে থাকতো, তাহলে হয়তো এখন কেউ তা বিশ্বাস করতে পারতো; কিন্তু যখন এর পূর্বে তারা সারাজীবন তাঁকে (সা.) 'সাদিক' (বা সত্যবাদী) বলে আখ্যায়িত করেছে, তখন হঠাৎ করে মিথ্যার এই অপবাদ! কে সত্য বলে মানতে পারে?

একইভাবে হিরাক্লিয়াস যখন আবু সুফিয়ানের কাছে মহানবী (সা.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, তিনি কি কখনো মিথ্যা বলেছেন? তখন উত্তরে সে বলে, আজ পর্যন্ত তো বলেননি। (আবু সুফিয়ান) বলে, আমি 'আজ পর্যন্ত' শব্দটি এজন্যই যুক্ত করেছিলাম, যাতে সন্দেহ সৃষ্টি হয়, হয়তো ভবিষ্যতে মিথ্যা বলতেও পারেন।

একইভাবেএকবার মহানবী (সা.) পাহাড়ে আরোহণ করে লোকদের ডাকেন। ইতঃপূর্বেও আমি এই ঘটনা বর্ণনা করেছি, এখন এটি মূলত সত্যবাদিতার প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে। যখন তারা একত্রিত হয়, তখন তিনি (সা.) বলেন, আমি যদি তোমাদের বলি, অমুক উপত্যকায় একটি সেনাদল জড়ো হয়েছে যারা তোমাদের ওপর আক্রমণ করতে যাচ্ছে,তাহলে বিশ্বাস করবে কী? তারা বলে, আমরা বিশ্বাস করব। অথচ মক্কাবাসীদের অজ্ঞাতে এত বড়ো সেনা-সমাবেশ এত কাছাকাছি জড়ো হওয়া অসম্ভব ছিল। অতএব, ওই লোকদের এ ধরনের কথাও– যা বাহ্যত ঘটা অসম্ভব, অর্থাৎ যা বাস্তবে ঘটতেই পারে না, সম্ভবই নয়– তাঁর (সা.) মুখ থেকে শুনে তা মেনে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাওয়া এটাই প্রমাণ করে যে, তাঁর (সা.) সত্যবাদিতার ওপর ঐ লোকদের এত দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তিনি (সা.) মিথ্যা বলতে পারেন বা ধোঁকা দিতে পারেন, এটি তারা অসম্ভব বলেই মনে করতো।"

(হাস্তিয়ে বারি তা'লা, আনওয়ারুল উলুম, খণ্ড-৬, পৃ: ৩০৯-৩১০)

এ প্রসঙ্গেই তিনি (রা.) আরও বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর কোন্ বিষয়টি বিরোধীদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতো? তারা তো প্রাথমিকভাবে পবিত্র কুরআন দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা তাদেরকে সেভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি, যা (তাদেরকে) তাঁর (সা.) শিক্ষার ওপর আমল করাতে বা তাঁর (সা.) বয়আতভুক্ত হওয়ার মাধ্যম হতে পারতো। বরং, তা ছিল মুহাম্মদ (সা.)-এর (দাবির) পূর্ববর্তী জীবন; তিনি (সা.) তাদের মাঝেই থেকেছেন; তাঁর (সা.) বিশ্বস্ততা, তাঁর (সা.) সততা, মানবজাতির প্রতি তাঁর (সা.) সহানুভূতি এবং আত্মত্যাগই তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতো। দাবির পূর্বে তিনি (সা.) তাদেরকে শির্ ক করতে বারণ করতেন না, কারণ তখনও ঐশী নির্দেশ আসেনি; কিন্তু তিনি (সা.) নিজে কখনো মুশরিক ছিলেন না। তাঁর (সা.) আচার আচরণের সৌন্দর্যই এর প্রধান কারণ ছিল, যার প্রভাব পড়তো, এবং এই প্রভাবটি তাদের অন্তরে গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে যাচ্ছিল। অর্থাৎ, এটি লোকদের ওপর প্রভাব বিস্তার করছিল। তাঁর (সা.) পু ণ্যের যে মান বা অবস্থ া ছিল, তাঁর (সা.) যে অনুপম আদর্শ ছিল, তা সর্বাবস্থায় লোকদের ওপর প্রভাব ফেলছিল এবং এর বিপরীতে তারা চোখ তুলে তাকাতেও পারতো না। যেমন আমি পূর্বেও এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছি যে, মক্কার পাহাড়ে আরোহণ করে তিনি (সা.) যখন লোকদের ডাকেন যে, 'আমি যদি বলি যে বিশাল এক সেনাদল অপেক্ষা করছে, তাহলে তোমরা তা বিশ্বাস করবে কী?' যদিও এটি অসম্ভব ছিল, তবুও লোকেরা একথাই বলেছিল যে, হ্যাঁ, আমরা বিশ্বাস করব। আর এর কারণ হলো, তারা জানতো, তিনি (সা.) কখনো মিথ্যা কথা বলেননি। তারা এ টিই বলেছিল, আমরা কখনো আপনাকে মিথ্যা বলতে শুনিনি, আপনি সর্বদা বিশ্বস্ত থেকেছেন, সর্বদা সত্য বলেছেন, তাই আপনার একথাও আমরা বিশ্বাস করব। এর প্রত্যুত্তরে তিনি (সা.) বলেন, আচ্ছা! বিষয়টি যদি এমনই হয়, তাহলে আমি তোমাদেরকে আরেকটি সত্য কথা বলছি; আর সেই সত্য কথাটি হলো, 'খোদা এক এবং শিরক অত্যন্ত জঘন্য বিষয়। এক খোদার ইবাদত করো, শিরক পরিহার করো, অন্যথায় তোমাদের ওপর আযাব নেমে আসবে।' তাঁর (সা.) জীবনাচরণ তাদের ওপর প্রভাব ফেলেছিল ঠিকই কিন্ত তাঁর এ কথাটি তাদের ওপর কোনো প্রভাব ফেলেনি। তাঁর (সা.) কর্ম, তাঁর (সা.) সত্যবাদিতা, তাঁর (সা.) সততা এবং তাঁর (সা.) পুণ্য তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল; কিন্তু যখন এই দাবি উপস্থাপন করেন, তখন তা কানো প্রভাব বিস্তার করে নি আর তারা এটি অস্বীকার করে।

সুতরাং, মূল বিষয় হলো এই যে, মানুষের আদর্শ এমন হওয়া উচিত, তার আমল বা কর্ম এমন হওয়া উচিত যা মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে। আর যখন এমনটি হবে, তখন কোনো না কোনো এক সময় আল্লাহ্ তা'লা এমন সব উপায়-উপকরণ সৃষ্টি করে দেন যখন তবলীগের পথও উন্মুক্ত হয়ে যায়; আর সেসব লোক ঘোর বিরোধীহয়ে থাকে, তারাই একসময় ইসলামের ক্রোড়ে আশ্রয় নিতে শুরু করে এবং প্রকৃত ইসলামকে চিনতেও শুরু করে।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-৭, পৃ: ৩৭৪-৩৭৫)

হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: খোদা তা'লা আমাদের নেতা ও মনিব, শেষ যুগের নবী, যিনি মুত্তাকীদের সরদার ছিলেন, তাঁকে নানান ধরনের সাহায্য-সমর্থন দিয়ে বিজয়ী ও সাহায্যপ্রাপ্ত করেছেন। যদিও প্রথম দিকে হযরত মূসা (আ.) এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর মতো হিজরতের দাগ তাঁরও ভাগ্যে জুটেছিল, কিন্তু সেই হিজরতই নিজের মাঝে বিজয় ও সাহায্যের ভিত্তি রাখতো। অতএব, হে বন্ধুরা! নিশ্চিত জেনো যে, মুত্তাকীকে কখনো ধ্বংস করা হয় না। যখন দুটি দল নিজেদের মাঝে শত্রুতা করে এবং বিরোধ চরম পর্যায়ে পৌঁছায়, তখন যে দলটি খোদা তা'লার দৃষ্টিতে মুত্তাকী ও পরহেযগার হয়, তাদের জন্য আকাশ থেকে সাহায্য অবতীর্ণ হয় এবং এভাবে আসমানী ফয়সালার মাধ্যমে ধর্মীয় বিবাদসমূহের নিষ্পত্তি ঘটে।" অর্থাৎ ধর্মীয় ঝগড়াগুলোর মীমাংসা হয়ে যায়।

দেখো, আমাদের নেতা ও মনিব, আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা.) কীভাবে দুর্বল অবস্থায় মক্কায় আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং সেই দিনগুলোতে আবু জাহেল প্রভৃতি কাফেরদের কেমন প্রতাপ ছিল, আর লক্ষ লক্ষ মানুষ মহানবী (সা.)-এর প্রাণের শত্রু হয়ে গিয়েছিল। তাহলে সেটি কী জিনিস ছিল যা পরিশেষে আমাদের নবী (সা.)-কে বিজয় ও সাফল্য দান করেছিল? নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, তা ছিল এই ন্যায়পরায়ণতা, সততা, অন্তরের পবিত্রতা এবং সত্যবাদিতা, যার কারণে এই সাফল্যগুলো অর্জিত হয়েছিল।

(রাযে হাকীকাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৪, পৃ: ১৫৫-১৫৬)

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ্ আমাদের নবী (সা.)-কে সম্বোধন করে বলেন: إِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ (সূরা আল-কলম ৬৮:৫) অর্থাৎ, তুমি এক মহান নৈতিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এই ব্যাখ্যার আলোকে এর অর্থ হলো, সব ধরনের চারিত্রিক গুণাবলি যেমন দানশীলতা, বীরত্ব, ন্যায়বিচার, দয়া, অনুগ্রহ, সত্যবাদিতা, সাহস ইত্যাদি তোমার মাঝে একত্রিত রয়েছে। মোটকথা মানুষের হৃদয়ে যত প্রকার শক্তি বিদ্যমান থাকে যেমন-শিষ্টাচার, লজ্জা, বিশ্বস্ততা, মানবতা, আত্মমর্যাদাবোধ, দৃঢ়তা, সতীত্ব, যাহাদত/বৈরাগ্য, এতেদাল/পরিমিতিবোধ, সহমর্মিতা; অনুরূপভাবে বীরত্ব, দানশীলতা, ক্ষমা, ধৈর্য, অনুগ্রহ, সততা, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি-এই সমস্ত স্বভাবজাত অবস্থাগুলো যখন বুদ্ধি ও বিবেচনার পরামর্শক্রমে নিজ নিজ উপযুক্ত স্থান ও সুযোগ অনুযায়ী প্রকাশ করা হবে, তখন সেই সবকিছুর সমষ্টিকে 'আখলাক' বা 'নৈতিকতা' বলা হবে।"

(ইসলামী ওসুল কি ফিলাসফী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১০, পৃ: ৩৩৩, বাংলা অনুবাদ-ইসলামী নীতি-দর্শন)

সুতরাং আখলাক বা নৈতিকতা কেবল এটিই নয় যে, কারও সাথে সদাচরণের সাথে সাক্ষাৎ করা হলো বা সালাম করা হলো; বরং মহানবী (সা.)-এর আদর্শ অনুযায়ী সমস্ত পুণ্যকর্ম এবং মানুষের সাথে যাবতীয় আচার-ব্যবহারে এগুলোর প্রকাশই হলো উচ্চাঙ্গের নৈতিকতা, যার প্রতি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

যুগ ইমামের বাণী

পরনিন্দা ও পরচর্চা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা উচিত।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড,পৃ: ৪০৭)

দোয়াপ্রার্থী: Mirza Naeema Begum & Family
Bithari, 24 PGS (N)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সুদ খাইও না যাহা (ধন-সম্পদ ও অনিষ্টকে) বহুগুণে বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার। (আলে ইমরান: ১৩১)

দোয়াপ্রার্থী: Azizur Rahaman Sb, Lalbag, Murshidabad

মহানবী (সা.) পৃথিবীতে সত্যবাদিতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এসেছিলেন, তাই বিভিন্ন উপলক্ষ্যে তাঁর (সা.) প্রতি ঈমান আনয়নকারীদেরকেও তিনি (সা.) সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার উপদেশ দিয়েছেন।

যেমন একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: "তোমাদের ওপর সত্য বলা ফরয, কারণ সত্য পুণ্যের দিকে নিয়ে যায় এবং পুণ্য জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। আর কোনো ব্যক্তি যখন ধারাবাহিকভাবে সত্য বলে এবং সত্যের সন্ধানে লিপ্ত থাকে, তখন একপর্যায়ে সে আল্লাহ্‌র কাছে 'সিদ্দীক' (মহাসত্যবাদী) -দের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আর তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকো, কারণ মিথ্যা পাপাচারের দিকে নিয়ে যায় এবং পাপাচার আগুনের দিকে নিয়ে যায়। আর মানুষ যখন মিথ্যা বলতেই থাকে এবং মিথ্যা বলার সুযোগ খুঁজতে থাকে, তখন একপর্যায়ে সে আল্লাহ্‌র কাছে 'কায্যাব' (মহামিথ্যাবাদী) হিসেবে তার নাম লিপিবদ্ধ হয়ে যায়।" আর যখন কায্যাব হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়, তখন সে আগুনের দিকে যায়।

(জামে তিরমিযি, কিতাবুল বির ওয়াস সিলাহ, হাদীস-১৯৭১)

সুতরাং এটি অত্যন্ত ভয়ের একটি স্থান।

হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) বর্ণিত আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে, যা তিনি মহানবী (সা.) পর্যন্ত পৌঁ ছিয়েছেন যে,তিনি (সা.) বলেছেন:

"নিশ্চয় মিথ্যা কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়-না গাম্ভীর্যের সময়, আর না ঠাট্টা-মশকরায়।" কতক লোক ঠাট্টা করে বলে যে, আমরা তো ঠাট্টাচ্ছলে মিথ্যা বলেছিলাম। ঠাট্টা-মশকরাতেও এর অনুমতি নেই। "আর এটিও উচিত নয় যে, কোনো ব্যক্তি তার সন্তানের সাথে ওয়াদা করে তারপর তা পূরণ করবে না।" নিশ্চয় সত্যবাদিতা পুণ্যের দিকে পথপ্রদর্শন করে এবং পুণ্য জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। আর নিশ্চয় মিথ্যা পাপের দিকে নিয়ে যায় এবং পাপ আগুন অর্থাৎ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। সত্যবাদী ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয় যে, সে সত্য বলেছে এবং পুণ্য করেছে; আর মিথ্যাবাদী সম্পর্কে বলা হয় যে, সে মিথ্যা বলেছে এবং পাপ করেছে।

(আল জামি লি শাবিল ঈমান, বাইহাকি, খণ্ড-৬, পৃ: ৪৪১)

আল্লামা রাযী (রাহ.) সূরা তওবার ১১৯ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, আয়াতটি হলো: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (সূরা আত-তওবা, ৯:১১৯) অর্থাৎ, 'হে যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহ্ র তাক্বওয়া অবলম্বন করো এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।'এর ব্যাখ্যায় আল্লামা রাযী বলেন যে:এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কাছে আসে এবং বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি এমন এক ব্যক্তি যে নিজের পাপগুলো থেকে বাঁচতে চায়, কিন্তু মদ, ব্যভিচার, চুরি এবং মিথ্যা আমার খুব পছন্দ। এই অভ্যাসগুলো আমার মাঝে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। লোকেরা বলে যে, আপনি এই জিনিসগুলোকে হারাম সাব্যস্ত করেন। এখন আমি ঈমান তো এনেছি বা আনতে চাই, কিন্তু আপনি বলেন এগুলো হারাম, অথচ আমার মাঝে এগুলো অনেক বেশি মাত্রায় রয়েছে আর এই সবগুলো পরিত্যাগ করার পূর্ণ শক্তি আমার নেই। যদি আপনি কেবল একটি বিষয়ে সন্তুষ্ট হন, আমাকে এমন একটি বিষয় বলে দেন যা আমি ছেড়ে দেবো, তবে আমি আপনার প্রতি ঈমান আনব। তিনি (সা.) বলেন, "তাহলে ঠিক আছে, তুমি মিথ্যা বলা ছেড়ে দাও।" লোকটি এই অঙ্গীকার করে এবং মুসলমান হয়ে যায়। এরপর যখন সে মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে বের হয়, তখন তার কাছে মদ উপস্থাপন করা হয়। সে বলে, আমি যদি তা পান করি আর তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে জিজ্ঞেস করেন এবং আমি মিথ্যা বলি, তবে আমি অঙ্গীকার ভঙ্গের অপরাধী হবো; আর যদি সত্য বলি, তবে আমার ওপর শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। এটি ভেবে সে তা ছেড়ে দেয়। এরপর ব্যভিচারের সুযোগ আসে। তখন সবকিছু তার মনে পড়ে এবং সে সেটিও ত্যাগ করে, আর একইভাবে চুরিও। এরপর সে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে এসে বলে, আপনি যা করেছেন তা কতই না চমৎকার ছিল! আপনি যখন আমাকে মিথ্যা থেকে বারণ করেছেন, তখন বাকি সব পাপের দরজাও আমার জন্য বন্ধ হয়ে গেছে এবং এভাবে সে প্রতিটি পাপ থেকে তওবা করে নেয়।

(ইমাম রাযি সম্পাদিত আত তফসীরুল কবীর, খণ্ড-১৬, পৃ: ২২৭)

হযরত আবু বকর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের বিষয়ে লেখা আছে, উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) মহানবী (সা.)-এর গভীর ও একনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। যখন তিনি (সা.) আবির্ভূত হন, তখন কুরাইশরা হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে আসে এবং বলে, হে আবু বকর! তোমার এই সঙ্গীটি পাগল হয়ে গেছে (নাউযুবিল্লাহ)। হযরত আবু বকর (রা.) জিজ্ঞেস করেন, তাঁর বিষয়টি কী? লোকেরা বললো, সে মসজিদুল হারামে লোকদেরকে তওহীদ অর্থাৎ এক খোদার দিকে ডাকে এবং দাবি করে যে ,সে একজন নবী। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন, তিনি কি এই কথা বলেছেন? লোকেরা বললো, হ্যাঁ, আর তিনি এই কথা মসজিদুল হারামেই বলছেন। সুতরাং, হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে যান এবং তাঁর (সা.) দরজায় কড়া নাড়েন ও তাঁকে (সা.) বাইরে ডাকেন। যখন তিনি (সা.) তাঁর সামনে আসেন, তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হে আবুল কাসেম! আপনার সম্পর্কে আমার কাছে এ কেমন কথা পৌঁছেছে? মহানবী (সা.) বলেন, হে আবু বকর! আমার সম্পর্কে তোমার কাছে কী কথা পৌঁছেছে? হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমার কাছে এই খবর পৌঁছেছে যে, আপনি আল্লাহ্‌র তওহীদের দিকে ডাকছেন এবং দাবি করছেন যে, আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল। মহানবী (সা.) বললেন, হ্যাঁ আবু বকর! নিশ্চয় আমার মহাপ্রতাপান্বিত খোদা আমাকে বশীর (সুসংবাদদাতা) এবং নযীর (সতর্ককারী) বানিয়েছেন এবং আমাকে ইবরাহীমের দোয়ার ফসল বানিয়েছেন আরআমাকে সমগ্র মানবের প্রতি প্রেরণ করেছেন।

হযরত আবু বকর (রা.) তাঁকে বললেন, আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে কখনো মিথ্যা বলতে দেখি নি। আপনি অবশ্যই নিজ আমানতের মর্যাদা রক্ষায়, আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখতে এবং উত্তম কাজ সম্পাদন করার ক্ষেত্রে নবুওয়তের সবচেয়ে বেশি হকদার। আপনার হাত এগিয়ে দিন,যেন আমি আপনার বয়আত করতে পারি।

অতঃপর রসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর হাত এগিয়ে দিলেন এবং হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর (সা.) নিকট বয়আত করলেন আর তাঁর সত্যায়ন করলেন। এমনকি স্বীকার করলেন যে, আপনি যা নিয়ে এসেছেন তা সত্য। মোটকথা, আল্লাহর কসম! মহানবী (সা.) যখন তাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানালেন তখন হযরত আবু বকর (রা.) কোনো বিলম্ব বা ইতস্তত করেন নি।

(রিয়াজুন নাজারাহ, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৫৪-১৫৬)

এ সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন,মহানবী (সা.) যখন নবুওয়তের বিষয়টি প্রকাশ করলেন তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) সিরিয়ারদিকে গিয়েছিলেন। যখন ফিরে আসলেন, তখনো পথেই ছিলেন - এক ব্যক্তির সাথে তাঁর দেখা হলো। তার কাছে মক্কার খবরাখবর জানতে চাইলেন এবং বললেন, কোনো নূতন খবর শোনাও। এটি একটি সাধারণ নিয়ম যে, মানুষ যখন সফর থেকে ফিরে আসে তখন যদি কোনো দেশবাসীকে পায় তবে তার কাছে দেশের অবস্থা জিজ্ঞাসা করে। সে বলল, নতুন কথা হলো তোমার বন্ধু মু হাম্মদ (সা.) পয়গম্বরীর দাবি করেছেন। তিনি শোনামাত্রই বললেন, তিনি যদি এ দাবি করে থাকেন তবে নিশ্চিতভাবেই তিনি সত্যবাদী। এ থেকে বোঝা যায়, তাঁর (সা.) বিষয়ে তাঁর কতটা সুধারণা ছিল। অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর ওপর হযরত আবু বকর (রা.)-এর কতটা সুধারণা ছিল। মুজিযা (তথা অলৌকিক নিদর্শন)-এর প্রয়োজনও মনে করেন নি। আর বাস্তবতা হলো, মুজিযা সেই ব্যক্তিই চায়- যে অবস্থা সম্পর্কে অবগত নয় এবং যেখানে অপরিচিতি আছে এবং সে সান্ত্বনা পাবার জন্য তা বলে; কিন্তু যার মনে কোনো অস্বীকারই নেই তার মুজিযার কী প্রয়োজন! মোদ্দা কথা, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) পথেই শুনে ঈমান আনলেন এবং যখন মক্কায় পৌঁছালেন তখন মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে জানতে চাইলেন, আপনি কি নবুওয়তের দাবি করেছেন? মহানবী (সা.) বললেন, হ্যাঁ, সঠিক। এটি শুনে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)বললেন, আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি আপনার প্রথম সত্যায়নকারী।"(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৩৭)

এই বিষয়টি বুঝতে পারা এক মহা সৌভাগ্য যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে যে ব্যক্তি (সত্যকে) গ্রহণ করেনি, তার মধ্যে বিশেষ কোনো যোগ্যতা বা গুণ নেই। প্রকৃত যোগ্য ও সৌভাগ্যবান সে-ই, যে প্রথম দিকেই দাওয়াত শুনে বয়আত গ্রহণ করে এবং তা মেনে নেয়। যে ব্যক্তি তালবাহানা বা বিতর্ক করে, তার মাঝে কোনো বিশেষত্ব বা গুণ নেই। কিন্তু যখন খোদা তা'লা (সত্যকে) উন্মোচিত করে দেন তখন তো পাথর আর গাছপালাও কথা বলতে শুরু করে। অর্থাৎ যখন সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যায় এবং অলৌকিক নিদর্শনগুলো প্রকাশ পেতে থাকে তখন যদি কেউ গ্রহণ করে- সেটি তো যে-কেউ করতে পারে। সবচেয়ে বেশি মূল্যবান ও মর্যাদাবান সেই ব্যক্তি- যিনি শুরুতেই সত্যকে গ্রহণ করেন, যেমন হযরত আবু বকর (রা.) করেছিলেন। তিনি (রা.) কোনো মুজিযা দেখাতে বলেন নি। এমনকি মহানবী (সা.)-এর মুখ থেকে ভালোভাবে কথা শোনার আগেই ঈমান এনেছিলেন। অর্থাৎ দাবির ঘোষণা শোনার আগেই বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। বর্ণিত আছে, হযরত আবু বকর (রা.) নিজের ব্যবসায়িক সফরে বাইরে ছিলেন। তিনি (রা.) এই পুরো ঘটনাটি বর্ণনা করে বলেছেন, পথিমধ্যে একজনের সাথে তাঁর দেখা হলো এবং তিনি তার কাছে বর্তমানের কোনো বিশেষ খবর জানতে চাইলেন। সেই ব্যক্তি জানালো যে, আপনার বন্ধু নবুওয়তের দাবি করেছেন। হযরত আবু বকর (রা.) তা শুনেই বললেন, তিনি যদি নবুওয়তের দাবি করে থাকেন, তবে তিনি অবশ্যই সত্যবাদী।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন,এখন গভীরভাবে লক্ষ্য করুন! হযরত আবু বকর (রা.) সেই সময় কোনো নিদর্শন বা মুজিযা দেখতে চাননি, বরং শোনার সাথে সাথেই ঈমান এনেছিলেন। এমনকি এ দাবির কথা তিনি স্বয়ং মহানবী (সা.)-এর (পবিত্র) মুখ থেকে শোনেন নি, বরং অন্য এক ব্যক্তির মাধ্যমে শুনেছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তা মেনে নিয়েছিলেন। এটি কত না শক্তিশালী ঈমান! মহানবী (সা.)-এর নামের সাথে সম্পৃক্ত বর্ণনা শুনেই তিনি (রা.)

তাতে মিথ্যার কোনো অবকাশ আছে বলে মনে করেন নি। যখনই এই বর্ণনা শুনলেন যে, তিনি (সা.) নবুওয়তের দাবি করেছেন, অমনি তিনি বিশ্বাস স্থাপন করলেন; কারণ তিনি জানতেন, মহানবী (সা.) কখনো মিথ্যা বলতে পারেন না। দেখুন! হযরত আবু বকর (রা.) কোনো অলৌকিক নিদর্শন চান নি। এ কারণেই তাঁর নাম হয়েছিল 'সিদ্দীক'– অর্থাৎ সততায়ভরপুর এক ব্যক্তিত্ব। তিনি কেবল চেহারা দেখেই চিনে ফেলেছিলেন যে, এই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নন। সুতরাং সত্যবাদীদের চেনা এবং তাঁদের মেনে নেওয়া কোনো কঠিন বিষয় নয় , কেননা তাঁদের নিদর্শনসমূহ প্রকাশমান থাকে।

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১২২-১২৩)

হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) এ বিষয়ে এক স্থানে বলেন,

"আমি হযরত খাদীজা (রা.)-এর সেই সাক্ষ্যকে উপেক্ষা করতে পারি না, যা তিনি মহানবী (সা.)-এর নবু ওয়তের দাবির শুরুতে প্রদান করেছিলেন। রসূলুল্লাহ (সা.) যখন ঐশী আহ্বান লাভ করলেন এবং বুঝলেন যে,সমগ্র দুনিয়া এই দাওয়াতের বিরোধিতা করবে, তখন তিনি (সা.) বললেন, হে খাদীজা! আমার নিজের জীবনের জন্য ভয় হচ্ছে। তখন তিনি বললেন, আপনি খুশি হোন! আল্লাহর কসম, আল্লাহ কখনো আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না।

হযরত খাদিজা (রা.) বললেন: মানুষ যা-ই বলুক, আপনি আনন্দিত থাকুন। যদি এটি সত্য হয়, তবে আল্লাহ আপনাকে কখনো অপদস্থ করবেন না। কারণ আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, সদা সত্য কথা বলেন, দুঃখীদের কষ্ট মোচন করেন, অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করেন, মেহমানদারি করেন এবং উত্তম কাজে সবসময় এগিয়ে থাকেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) বলেন, একবার ভাবুন! পঞ্চান্ন বছর বয়সের স্ত্রী, যিনি তাঁর (সা.) নিজ শহরের ও স্বজাতির নারী ছিলেন, যিনি পনের বছর ধরে তাঁর (সা.) সংসার করছিলেন, তিনি কী সাক্ষ্য দিচ্ছেন! এখানে এটি প্রণিধানযোগ্য যে, হযরত খাদীজা (রা.) এ সাক্ষ্য এমন সময়ে প্রদান করেছিলেন যখন রসূলুল্লাহ (সা.) দুঃখ ভারাক্রান্ত ও উদ্বিগ্ন ছিলেন। যদি তাঁর (সা.)-এর মধ্যে এসব গুণ না থাকত, তবে একথা কোনোভাবেই সান্ত্বনার কারণ হতে পারত না। (ইরশাদাতে নুর, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৩০-৩৩১)

শে'বে আবি তালিবে অবরোধের সময় যখন প্রায় তিন বছর অতিবাহিত হয়েছিল তখন রসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্ঞাত হয়ে তাঁর চাচা আবু তালিবকে জানালেন, কাবায় ঝুলিয়ে রাখা বয়কটের চুক্তিপত্রটি শুধু আল্লাহর নাম ছাড়া বাকিটুকু উইপোকা খেয়ে ফেলেছে।

আবু তালিবের রসূল (সা.)-এর কথার ওপর এতটাই বিশ্বাস ছিল যে, তিনি তাঁর ভাইদের কাছে বিষয়টি উল্লেখ করে বললেন , আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ (সা.) কখনো আমার কাছে মিথ্যা বলেন নি।

এরপর তিনি তাদের সাথে নিয়ে কুরাইশ নেতাদের কাছে গিয়ে বললেন, আমার ভাতিজা আমাকে জানিয়েছে যে, তোমাদের এই চুক্তিপত্র উইপোকা খেয়ে ফেলেছে, শুধু আল্লাহর নাম ছাড়া। যদি সে সত্য প্রমাণিত হয়, তবে তোমরা অবরোধ বাতিল করবে; আর যদি সে মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তবে আমি তাকে তোমাদের হাতে তুলে দেবো– তোমরা ইচ্ছা করলে তাকে হত্যা করো বা জীবিত রাখো। তারা বলল, এটি ন্যায্য কথা। তারপর যখন সেই চুক্তিপত্রটি দেখা হলো, তা ঠিক তেমনই পাওয়া গেল, যেমনটি মহানবী (সা.) বলেছেন। ফলে কুরাইশরা লজ্জিত হলো।

(আল ওয়াফা বি আহওয়ালিল মুস্তফা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩১৫-৩১৬)

একবার কুরাইশরা তাদের এক নেতা উতবাকে প্রতিনিধি করে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে প্রেরণ করে। সে এসে বলে, আপনি কেন আমাদের উপাস্যদের নিন্দা করেন এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের পথভ্রষ্ট আখ্যা দেন? আপনি যা চান আমরা তা পূরণ করব, আপনি শুধু এসব কথা বলা বন্ধ করুন। মহানবী (সা.) ধৈর্য সহকারে নীরবে তার কথা শুনতে থাকেন। সে যখন তার সব কথা শেষ করল তখন মহানবী (সা.) সূরা হা মীম ফুসসিলাত (অর্থাৎ হা মীম আস-সাজদার)-এর কিছু আয়াত তিলাওয়াত করেন। এবং যখন তিনি এই স্থলে পৌঁছান যে, আমি তোমাদেরকে আদ ও সামুদের মতো আযাব থেকে সতর্ক করছি। তখন উতবা তাঁকে (সা.) থামিয়ে দিয়ে বলে, এখন শেষ করুন। এরপর উতবা উঠে নিজের সঙ্গীদের কাছে চলে আসে। সে কুরায়েশদের কাছে গিয়ে বলে, আমি জানি মুহাম্মদ (সা.) যখন কোন কথা বলে তখন কখনোই মিথ্যা বলে না। আমার ভয় হয় তোমাদের ওপর আযাব না আপতিত হয়। (আস সীরাতুল হালবিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪২৮-৪২৯)

আবু জাহলের সাক্ষ্যও পাওয়া যায়। হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, আবু জাহল মহানবী (সা.)-কে বলে, আমরা আপনাকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করি না বরং সেটিকে মিথ্যা আখ্যায়িত করি যা নিয়ে আপনি আবির্ভূত হয়েছেন। অর্থাৎ, আপনার ধর্মকে মিথ্যা আখ্যায়িত করি।

(আল জামি আত তিরমিযি, কিতাব তফসীরুল কুরআন, হাদীস-৩০৬৪)

একটি রেওয়াত রয়েছে, আখনাস বিন শারীক বদরের দিন আবু জাহলের সাথে সাক্ষাত করে। সে বলে, হে আবুল হাকাম! এখানে আমার ও তোমার মাঝে আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছে এমন কেউ নেই। আমাকে মুহাম্মদ (সা.)-এর ব্যাপারে সত্যি সত্যি বল, সে কি সত্যবাদী নাকি মিথ্যাবাদী। আবু জাহল উত্তরে বলে, আল্লাহ্‌র কসম! মুহাম্মদ (সা.) নিঃসন্দেহে সত্যবাদী এবং মুহাম্মদ (সা.) কখনো মিথ্যা বলেন নি। (শারাহুশ শিফা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩০৩-৩০৪)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এক স্থানে বলেন,

"মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.) এর শত্রুরা কি নিজ রসূলকে চিনতে পারে নি যে, তারা তাঁকে অস্বীকার করছে। এটি কতই না বিস্ময়কর ব্যাপার যে, তারা চল্লিশ বছর যাবত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-কে দেখেছে। তাঁর চরিত্র ও স্বভাব তারা প্রত্যক্ষ করেছে। তারা নিজেদের চাক্ষুষ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে এই বিষয়টিকে স্বীকার করেছে যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.) অত্যন্ত সত্যবাদী মানুষ। কিন্তু যখন এই সত্যবাদী মানুষ এ কথা বললো যে, আমি খোদার পক্ষ থেকে তোমাদের হেদায়াতের জন্য প্রেরিত হয়ে ছি। তখন তাঁর বিরোধীতায় দণ্ডায়মান হয়ে গেল। যদি কোন অপরিচিত ব্যক্তি বলতো তাহলে সে অপারগ বিবেচিত হতো। তার সম্পর্কে ধারণা করা যেত যে, যেহেতু সে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-কে দেখে নি সেজন্য সে তাঁর প্রতি এমন কথা আরোপ করছে যে, তিনি (সা.) খোদা তা'লার নামে মিথ্যা বানিয়ে বলছেন। কিন্তু মক্কার অধিবাসীরা যাদের সম্মুখে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর গোটা জীবন একটি উন্মুক্ত পুস্তকের ন্যায় ছিল, তাঁকে কিভাবে মিথ্যা রটনাকারী বলতে লাগলো! এটা কীভাবে সম্ভব ছিল যে, তাঁকে মিথ্যাবাদী বলবে? অথচ মনে মনে জানতো যে, তিনি সত্যবাদী।

আবু জাহল মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.) -এর কত বড়ো শত্রু ছিল। এখনই একটি সাক্ষ্য তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু এক স্থানে সে বলে দিয়েছে যেটি হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, আমরা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলি না, আমরা সেই শিক্ষাকে অস্বীকার করি যেটিকে আপনি উপস্থাপন করেন। অর্থাৎ, আবু জাহলের মতো শত্রু ও নোংরা মনের মানুষের হৃদয়ও মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-কে মিথ্যা বলার জন্য প্রস্তুত ছিল না। মিথ্যাবাদী বলতে গিয়ে যেন তার বিবেকও তাকে তিরস্কার করতো এবং তার হৃদস্পন্দন বেড়ে যেত যে, আমি কত নোংরা কাজ করছি। কিন্তু সে এই অজুহাত বানিয়েছে যে, আমি তো মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষাকে অস্বীকার করি। তাঁকে তো মিথ্যাবাদী বলছি না। পাপের চেয়ে পাপের পক্ষে যে অজুহাত দাঁড় করানো হয়েছে সেটি আরো খারাপ বিষয়টি এমন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এর মাধ্যমে তার সেই প্রভাব অনুমান করা যায় যা চরম শত্রুর হৃদয়েও তাঁর সত্যতা ও সত্যবাদীতার কারণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

উমাইয়া বিন খালফও তাঁর চরম শত্রু ছিল। কিন্তু এক স্থলে তার মুখ থেকেও এই কথা বের হয় যে, খোদার কসম! যখন মুহাম্মদ (সা.) কথা বলে সত্য কথাই বলে, মিথ্যা বলে না।

কথিত আছে,আসল জাদু সেটাই যা মানুষের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে। এটি মুহাম্মদের (সা.) কত বড়ো জাদু যে, তিনি (সা.) নিজের শত্রুদের দ্বারাও নিজের সত্যতা ও সত্যবাদীতা স্বীকার করিয়েছেন।"

(তফসীরে কবীর, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৬৩)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন মদীনাতে পৌঁছলেন তখন মানুষ দ্রুততার সাথে তার কাছে গেল, তারা বলতে লাগলো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আগমন করেছেন। তিন বার এ কথা বলা হলো। তিনি (রা.) বলেন, আমিও লোকদের সাথে গেলাম যাতে করে আমিও দর্শন করি।

আমি যখন তাঁর (সা.) চেহারা খুব ভালো করে দেখলাম, তখন আমি বুঝে গেলাম এ চেহারা মিথ্যাবাদীর নয়। আর প্রথম কথা যা তিনি (সা.) বললেন এবং আমি তা শুনলাম। তিনি (সা.) বললেন, হে লোক সকল! সালামকে ছড়িয়ে দাও, (অভাবীদের) আহার করাও, রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়দের সাথে উত্তম ব্যবহার কর। রাতে মানুষ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন নামায পড় তাতে করে তোমরা নিরাপত্তার সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুল আতইমা, হাদীস-৩২৫১)

মদীনার ইহুদীরাও সাক্ষ্য দেয়। তাদের সাক্ষ্যও পাওয়া যায়।

মুসলমান এবং বানু কুরায়যা গোত্রের মাঝে পরস্পর সহযোগীতার চুক্তি ছিল। পরিখার যুদ্ধের সময় বনু নাযীর গোত্রের সরদার হুয়াই বিন আখতাব বনু কুরায়যাকে সাথে নিয়ে সর্দার কা'ব বিন আসাদ কুরযির কাছে যায়। আর মুসলমানদের পরাজিত করার জন্য তাকে মুসলমানদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করতে এবং কু রায়শদের সাহায্য করার জন্য প্রচেষ্টা চালায়। সে সময়ে কা'ব বিন আসাদ যে বানু কু রায়যা গোত্রের সর্দার এবং মুসলমানদের শত্রু ছিল বলে উঠে, "আমি মুহাম্মদের (সা.) সাথে চুক্তি করেছি এবং মুহাম্মদের (সা.) সাথে কৃত চুক্তি আমি কখনো ভঙ্গ করবো না। আমি তার মাঝে বিশ্বস্ততা ও সততা ছাড়া আর কিছুই দেখি নি।

(আল বাদাইয়াতু ওয়ান নিহাইয়া, খণ্ড-৬, পৃ: ৩৫-৩৬)

অনুরূপ আরেকটি বর্ণনায় উবায়েদ বিন উ মায়ের বর্ণনা করেন, তিনি এক ব্যক্তিকে হযরত ইবনে উমর (রা.)-কে এ কথা বলতে শুনেছেন, আপনি কি

রসূলুল্লাহ (সা.)-কে এ কথা বলতে শুনেন নাই যে, আমি হাস্যরস করে থাকি তবে তাতেও আমি সত্য কথাই বলি। তিনি (রা.) বলেন, হ্যাঁ।

(আল মুজামুল কাবীর, লি তিবরানি, খণ্ড-১২, পৃ: ৩৫-৩৬)

বাহায বিন হাকীম তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি মানুষ হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে তার জন্য ধ্বংস, তার জন্য ধ্বংস, তার জন্য ধ্বংস। সুতরাং সামান্যতম মিথ্যা হতেও তিনি কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এবং সতর্ক করেছেন।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, হাদীস-৪৯৯০)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সা.)-এর যে কথা আমি শুনতাম তা লিখে নিতাম এবং আমি তা স্মরণ রাখতে চাইতাম। পরবর্তীতে কুরেয়শরা আমাকে আটকে দেয় এবং বলে তুমি যা শুন তা কি তুমি লিখে নাও? অথচ রসূলুল্লাহ (সা.) তো একজন রক্ত মাংসের মানুষ। তিনি (সা.) রাগান্বিত হয়েও কথা বলেন এবং আনন্দিত হয়েও কথা বলেন। যাহোক আমি লেখা বন্ধ করে দিলাম। পরবর্তীতে এ কথাটি আ মি মহানবী (সা.)-কে বলি। তিনি (সা.) স্বীয় আঙ্গুল দিয়ে নিজের মুখের দিকে ইঙ্গিত করলেন এবং বললেন, লিখে নিও। আঙ্গুল দিয়ে নিজের মুখের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি (সা.) বললেন,

সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! এখান থেকে সত্য ও ন্যায়সঙ্গত কথা ছাড়া অন্য কিছুই বের হয় না।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল ইলম, হাদীস-৩৬৪৬)

এ মুখ হতে সত্য ও ন্যায়সঙ্গত কথা-ই বের হবে তাই তুমি বিনা দ্বিধায় লিখে নিও। অত্যন্ত সূক্ষ্মতা ও প্রজ্ঞার সাথে তিনি (সা.) মিথ্যার বিরুদ্ধে উপদেশ দিতেন।

একটি রেওয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমের (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন আমার মা আমাকে ডাক দেয় আর সে সময়ে মহানবী (সা.) আমাদের ঘরে উপস্থিত ছিলেন, আমার মা বললেন, এদিকে এসো, আমি তোমাকে কিছু দিব। মহানবী (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তাকে কী দিতে চাচ্ছ? তিনি নিবেদন করলেন, আমি তাকে খেজুর দিব। মহানবী (সা.) তাকে বললেন, তুমি যদি তাকে কিছু না দিতে তাহলে এটি তোমার বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা লেখা হতো। এতটা সূক্ষ্মতা ছিল।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, হাদীস-৪৯৯১)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, সত্যের ব্যাপারে মহানবী (সা.)-এর ব্যক্তিগত মান এত উচ্চ ছিল যে, তাঁর জাতি তাঁর নামই রেখেছিল সিদ্দিক। তিনি (সা.) তাঁর অনুসারিদেরও সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য সর্বদা উপদেশ দিতেন। নিজের মানতো উন্নত ছিলই, অনুসারীদেরও সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার উপদেশ দিতেন এবং এমন উচ্চ মানের সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চাইতেন যা সর্বপ্রকার মিথ্যার সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত।

তিনি (সা.) বলতেন, সত্যই পুণ্যের দিকে মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট করে, আর পুণ্য মানুষকে জান্নাত লাভের যোগ্য করে তুলে। আর সত্যের প্রকৃত মান হলো, মানুষ সদা সত্য বলতে থাকবে এমনকি খোদার দৃষ্টিতেও সত্যবাদী হিসেবে পরিগণিত হবে।

একদা মহানবী (সা.)-এর কাছে একজন ব্যক্তি বন্দী হয়ে আসে, যে অনেক মুসলমানকে হত্যা করেছিল। হযরত উমর (রা.) মনে করতেন যে, এই ব্যক্তি ওয়াজিবুল কতল (হত্যা করা আবশ্যক) এবং তিনি বারবার মহানবী (সা.)-এর মুখের দিকে তাকাচ্ছিলেন যে, যদি তিনি (সা.) ইশারা করেন তাহলে তাকে হত্যা করবেন। যখন সেই ব্যক্তি উঠে চলে গেল, তখন হযরত উমর (রা.) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! ঐ ব্যক্তি তো ওয়াজিবুল কতল ছিল।' তিনি (সা.) বললেন, 'ওয়াজিবুল কতল থাকলে তুমি তাকে হত্যা করলে না কেন?' তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি যদি চোখ দিয়ে ইশারা করতেন, তাহলে আমি তাকে হত্যা করতাম।' তিনি (সা.) বললেন, 'নবী ধোঁকাবাজ হয় না। আমি মুখে তো তার সাথে স্নেহের কথা বলব আর চোখে তাকে হত্যার ইশারা করব- এটা কীভাবে সম্ভব?"

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনওয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৪১৮)

এটা হতে পারে না। এটা তো ধোঁকা। আমার পক্ষ থেকে এটা কখনো হতে পারে না।' সুতরাং যেখানে তিনি সত্যবাদিতা ও স্পষ্টভাষিতার এমন মানদণ্ড স্থাপন করে গেছেন যে, শত্রুরাও তা স্বীকার না করে থাকতে পারেনি, সেখানে তিনি নিজের অনুসারীদেরকেও সত্যবাদিতার উচ্চ মান অর্জনের উপদেশ দিয়েছেন।

অতএব, আজ প্রতিটি আহমদীর কর্তব্য হলো, আমরা নিজেদের যাচাই করি যে, আমাদের সত্যবাদিতার মান কেমন এবং যেসব দুর্বলতা আছে সেগুলো আমাদের দূর করতে হবে। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে এর সৌভাগ্য দান করুন।

নামাযের পর আমি একটি গায়েবানা জানাযা পড়াবো, যা শাহিদা আহমদ সাহেবার। তিনি মির্যা নাসিম আহমদ সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। সম্প্রতি একানব্বই বছর বয়সে ইন্তে কাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মরহুমা মুসীয়া (ওসিয়তকারিণী) ছিলেন। তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর নাতনি, হযরত নওয়াব আব্দুল্লাহ খান সাহেব এবং হযরত সাহেবজাদী আমাতুল হাফীজ বেগম সাহেবার কন্যা ছিলেন। তাঁর চার জন পুত্রসন্তান রয়েছে।

তাঁর বড় ছেলে নোমান লিখেছেন যে, সবাই বলছে, তিনি আমাকে খুব ভালোবাসতেন।' মানুষের সাথে তাঁর খুব সুন্দর ব্যবহার ছিল। এরপর ঘরের বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'সব সময় ঘরে লোক (অতিথি) থাকুক এটি তার আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং অতিথি আপ্যায়নের খুব শখ ছিল; বরং তিনি পরিতাপ করে বলতেন , আমার যদি সৌভাগ্য হয় তাহলে আমি ঘর আরও বড় করে ফেলব, যাতে ঘরে অতিথি আসতে থাকে এবং তারা স্বাচ্ছন্দে কামরা পেতে পারে।'

একইভাবে তাঁর ছোট ছেলে রেজওয়ান লিখেছেন যে, তিনি অনেক গুণের অধিকারিনী ছিলেন। ধনী-গরিব, ছোট-বড় সবার কাছ থেকে তাঁর মৃত্যুতে বার্তা আসছে যে, কীভাবে তিনি সবার মাঝে নিজ ভালোবাসা বিতরণকরেছেন এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। তিনি সাদা মনের মানুষ ছিলেন, মানুষকে ভালোবাসতেন এবং সবার মন জয় করে নিতেন। বিশেষভাবে যে-সকল মানুষ যে কোন কারণে কোন প্রকার সমস্যা বা কষ্টে নিপতিত হতেন তিনি তাদের বিশেষ যত্ন নিতেন। সর্বদা তিনি দুর্বলদের পাশে দঁ ড়াতেন। তিনি (রিজওয়ান) বলেন, আমাদেরকে এবং ছোটদেরকে-ও সর্বদা দুর্বলদের পাশে দাঁড়ানোর উপদেশ দিতেন। দৃঢ় প্রত্যয়ী ও ভীষণ সাহসী ছিলেন; মাশাল্লাহ্ আমি-ও এটি লক্ষ্য করেছি। অত্যন্ত সাহসী ও দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন।

তার (মরহুমার) বোন ফওজিয়া শামীম সাহেবা লাহোরের প্রাক্তন লাজনার প্রেসিডেন্ট, সম্ভবত বর্তমানে-ও (প্রেসিডেন্টে) হতে পারেন। তিনি বলেন, অল্প কথায় যদি বলতে হয় তবে বলব- আত্মত্যাগ, ধৈর্য , সাহস এবং ভালোবাসার মূর্তপ্রতীক ছিলেন।

তার পুত্রবধু আমাতুল ওয়াকীল বলেন- তার আতিথিয়তার বৈশিষ্ট অতুলনীয় ছিল। এই বিষয়টি তার (সকল) সন্তান এবং (অন্যান্য) লোকেরাও আমাকে লিখেছে আর তার আতিথিয়তার পদ্ধতি ছিল অকৃত্রিম। শেষ বয়সে তিনি পড়ে গিয়ে কোমরে আঘাত পেয়েছিলেন। বাকি জীবন হুইল চেয়ারে অত্যন্ত ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সাথে রোগশোক পার করেছেন কিন্তু কখনো সামান্য পরিমাণ অভিযোগ-ও করেন নি।

(মরহুমার বোন) বলেন, তিনি খুবই সাহসী একজন রোগি ছিলেন এবং আমাদেরকে কখনো বিরক্ত করেন নি।

তার (মরহুমার) নাতনী খদিজা বলেন, সেই আতিথিয়তা সম্পর্কে তিনি-ও লিখেছেন যে, মরহুমা একজন স্নেহময়ী, সহানুভূতিশীল নারী ছিলেন আর বিগত কয়েক বছর যাবৎ (তিনি) প্রতি মাসে ২-৩বার পবিত্র কুরআন পাঠ করতেন। তিনি গরীবদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীলা ছিলেন। আমাদেরকেও গরীবদের জন্য দোয়া করার উপদেশ দিতেন। এখানে (ই.উ.কে-তে) বাস করেন তার ভাতিজির কন্যা স্নেহের নেহা বলেন, সর্বাবস্থায় (তিনি) ইতিবাচক মানসিকতা রাখতেন। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে (যথাযত) মূল্যায়ন করতেন এবং গৃহ পরিচারক-পরিচারিকদের প্রতিও অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। মনে হতো যেন তারা নিজের (পরিবারের) সদস্য।

(হুযূর বলেন) যাইহোক, আমিও দেখেছি তার ইতিবাচক মানসিকতার বিষয়টি হলো সাধারণত কারো সম্পর্কে কোন নেতিবাচক বা তার অনুভূতিতে আঘাত করে এমন কিছু বলা থেকে বিরত থাকতেন। মানুষের আবেগ-অনুভূতির প্রতি অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। তিনি বলেন- একবার তার একজন গৃহপরিচারিকার বিদায় দেওয়া হচ্ছিল। নিজের কন্যার বিদায়ের সময় মানুষ যেমন বিষন্ন হয়, তেমনি তিনিও মন খারাপ করেন যেন এখন (তার) ঘরের সৌন্দর্য হারিয়ে যাবে। কখনো কখনো মানুষের এমন (কিছু) পুণ্যকর্ম থাকে যা সাধারণত গোপন থাকে কিন্তু পরবর্তীতে যাদের প্রতি (নেক আমল) করা হয় তাদের মাধ্যমে জানা যায়। তিনিও সেসব মানুষের অর্ন্তভুক্ত ছিলেন। আল্লাহ্ মরহুমার প্রতি ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন।

(প্রকাশিত: আল-ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ১০ মে, ২০২৬)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

সময় সংকীর্ণ এবং জীবনের কর্তব্য অনন্ত। দ্রুত চল, কারণ সন্ধ্যা আগত প্রায়। (আমাদের শিক্ষা, পৃ: ১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Sk Imam Hossain sb, Khundanga, Bankura

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।" *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)

সীরাতুল মাহদী

–হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ.

{৪৪} বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আমার শ্রদ্ধেয় মা (হযরত ওয়ালিদা সাহেবা) আমাকে বলেছেন যে, আমার দাদা কাদিয়ানের সম্পত্তির উপর মালিকানা অধিকার বজায় রাখার জন্য প্রথম দিকে অনেক মামলা করেছিলেন। কাশ্মীরে চাকরি এবং তারপর যে টাকা তিনি জমিয়েছিলেন – যা প্রায় এক লাখ রুপি হয়েছিল – সবই এই মামলাগুলোতে খরচ হয়ে যায়।

আমার মা বলেছেন যে, হযরত সাহেব (মির্জা গোলাম আহমদ) বলতেন, সেই সময়ে ওই পরিমাণ টাকা দিয়ে একশ গুণ বড় সম্পত্তি কেনা যেত।

খাকসার আরজ করে যে, আমার দাদার দৃঢ় ইচ্ছা ছিল যে কোনো অবস্থাতেই কাদিয়ান ও আশেপাশের এলাকার পূর্বপুরুষের অধিকার হাতছাড়া না হয়। আমরা শুনেছি যে দাদা সাহেব প্রায়ই বলতেন, "কাদিয়ানের মালিকানা আমার কাছে একটা পুরো রাজ্যের চেয়েও প্রিয়।"

খাকসার আরও আরজ করে যে, কাদিয়ান আমাদের পূর্বপুরুষদের দ্বারা আবাদ করা হয়েছে, যাঁরা বাবরের রাজত্বের শেষের দিকে ভারতে এসেছিলেন। কাদিয়ান এবং তার চারপাশের কয়েক মাইল পর্যন্ত গ্রামগুলো আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে এক ধরনের রাজ্য বা জায়গীর হিসেবে ছিল।

রামগড়িয়া শিখদের সময়ে আমাদের পরিবারকে অনেক কষ্ট এবং ভয়ানক ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। পরবর্তীকালে মহারাজা রঞ্জিত সিংহের শাসনামলে আমাদের জায়গীরের কিছু অংশ আমাদের পূর্বপুরুষদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকে অনেক পুরনো অধিকার বাজেয়াপ্ত করা হয়। একাধিক মামলার পর, যাতে দাদা সাহেব প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছিলেন, শুধু কাদিয়ান এবং তার অন্তর্ভুক্ত দুটি গ্রামের মালিকানা অধিকার এবং কাদিয়ানের কাছাকাছি তিনটি গ্রামের তালুকদারি অধিকার আমাদের পরিবারের পক্ষে স্বীকৃত হয়। এই অধিকারগুলো এখনও বহাল আছে।

তবে আমার চাচা (তায়া সাহেব)–এর সময়ে আমাদেরই কিছু আত্মীয়ের মামলা–মোকদ্দমার কারণে কাদিয়ানের সম্পত্তির এক বড় অংশ মির্জা আজম বেগ লাহোরীর পরিবারের হাতে চলে যায়। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর তা তাদের কাছে ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিককালে আল্লাহর অনুগ্রহে সেই অংশটিও আমাদের ফিরে এসেছে।

আমার মা বলতেন যে, যখন চাচার সময়ে কাদিয়ানের বড় অংশ মির্জা আজম বেগের হাতে চলে যায়, তখন চাচা খুব গভীরভাবে আঘাত পান। এর ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং প্রায় দু'বছর পর সেই একই অসুখে মারা যান। প্রতিকূল ডিক্রি হওয়া সত্ত্বেও তিনি জীবিতকালে প্রতিপক্ষকে দখল বুঝিয়ে দেননি।

খাকসার আরজ করে যে, এটি সেই একই মামলা এবং একই ডিক্রি যার কথা প্রতিশ্রুত মসীহ (হযরত মির্জা গোলাম আহমদ) তাঁর কিতাবসমূহে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর ভাইকে মামলা না করতে এবং হক স্বীকার করে নিতে বলেছিলেন, কারণ আল্লাহ তাঁকে জানিয়েছিলেন যে মামলার ফলাফল প্রতিকূল হবে। কিন্তু হযরত সাহেব বলতেন যে তাঁর ভাই ওজর দেখিয়েছেন এবং মানেননি।

যখন ডিক্রির খবর আসে, তখন হযরত সাহেব তাঁর হুজরায় (প্রার্থনা কক্ষে) ছিলেন। চাচা কাঁপতে কাঁপতে ডিক্রির কাগজ হাতে নিয়ে ভিতরে আসেন, হযরত সাহেবের সামনে কাগজটি ছুড়ে দিয়ে বলেন:

"লে গোলাম আহমদ, জো তু কেহন্দা সি, ওহো এ হো গিয়া এ।"

(অর্থাৎ, "নে গোলাম আহমদ, তুমি যা বলছিলে তাই হয়েছে।")

এরপর তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান।

আমার মা বলেছেন যে, চাচার মৃত্যুর পর হযরত সাহেব মির্জা সুলতান আহমদকে ডেকে বললেন, "দখল বুঝিয়ে দাও।" তদনুসারে মির্জা সুলতান আহমদ ডিক্রি অনুসারে দখল বুঝিয়ে দেন এবং খরচ মেটানোর জন্য সম্পত্তির কিছু অংশ সস্তায় বিক্রি করে টাকাও পরিশোধ করেন।

(বর্ণনায় নোট: খাকসারের লেখা "কাদিয়ান এবং তার অন্তর্ভুক্ত দুটি গ্রামের মালিকানা অধিকার"এই অংশটি সঠিক নয়। এটি কলমের ভুলে লেখা হয়েছে। সঠিক কথা হলো– কাদিয়ানের ভিতরের দুটি গ্রাম (কাদেরাবাদ ও আহমদাবাদ) দাদা সাহেব ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পরে আবাদ করেছিলেন। তাই "এবং তার অন্তর্ভুক্ত দুটি গ্রাম"এই শব্দগুলো বাদ দেওয়া উচিত।)

{৪৫} বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

খাকসার আরজ করে যে, প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম)–এর পিতা মির্জা গোলাম মুর্তজা ১৮৭৬ সালের জুন মাসে অথবা হযরত সাহেবের এক লেখা অনুসারে ২০ আগস্ট ১৮৭৫ সালে ইন্তেকাল করেন। তাঁর ভাই মির্জা গোলাম কাদের ১৮৮৩ সালে মারা যান।

দাদা সাহেবের মৃত্যুকালীন বয়স আশির উপরে ছিল এবং চাচা সাহেবের বয়স প্রায় পঞ্চাশ–পঞ্চাশ পাঁচ বছর ছিল।

প্রতিশ্রুত মসীহের জন্ম তারিখ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তাঁর নিজের লেখায়ও এ বিষয়ে ভিন্নতা আছে। আসলে তখন শিখ আমল ছিল এবং জন্মের কোনো সঠিক রেকর্ড রাখা হতো না। হযরত সাহেব কোথাও ১৮৩৯ বা ১৮৪০ সাল বলেছেন, কিন্তু তাঁর অন্য লেখায় তা খণ্ডন করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি নিজেই তাঁর বয়সের অনুমানকে অনিশ্চিত বলে উল্লেখ করেছেন। (দেখুন বরাহীন আহমদিয়া, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯৩)। (সঠিক তারিখ ১৮৩৬ সাল বলে জানা গেছে।)

খাকসার আরও আরজ করে যে, হযরত সাহেবের আরেক লেখা থেকে দাদা সাহেবের মৃত্যুর তারিখ জুন ১৮৭৪ বলে মনে হয়। কিন্তু যতদূর আমার গবেষণা, ১৮৭৫ ও ১৮৭৪ উভয়ই ভুল। সরকারি কাগজপত্র অনুসারে সঠিক তারিখ ১৮৭৬ সাল। কিন্তু হযরত সাহেবের স্মৃতিতে তা সঠিক ছিল না। ওয়াল্লাহু আ'লাম (আল্লাহই সর্বজ্ঞ)।

{৪৬} বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। হযরত ওয়ালিদা সাহেবা আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম)–এর পাঁচ ভাই–বোন ছিলেন। সবার বড় ছিলেন তাঁর এক বোন, যিনি হোশিয়ারপুরের মির্জা গোলাম গাউসের সাথে বিবাহিত ছিলেন। এই বোন স্বপ্ন ও আধ্যাত্মিক দর্শন (রুয়া ও কাশফ)–এর অধিকারী ছিলেন। তাঁর নাম ছিল মুরাদ বিবি। তাঁর পরে ছিলেন মির্জা গোলাম কাদের সাহেব। তাঁর পরে একটি ছেলে, যিনি শৈশবে মারা যান। সেই ছেলের পরে প্রতিশ্রুত মসীহের আরেক বোন, যিনি তাঁর যমজ হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন এবং অল্প বয়সেই মারা যান। তাঁর নাম ছিল জান্নাত। সবার ছোট ছিলেন প্রতিশ্রুত মসীহ নিজে।

ওয়ালিদা সাহেবা বর্ণনা করতেন যে, প্রতিশ্রুত মসীহ বলেছেন, একবার তাঁদের বড় বোনকে স্বপ্নে একজন বুজুর্গ ব্যক্তি একটি তাবিজ দিয়েছিলেন। জেগে উঠে তিনি দেখেন, তাঁর হাতে ভূর্জপত্রে (বোজপত্রে) সূরা মরিয়ম লেখা রয়েছে।

{৪৭} বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। খাকসার আরজ করে যে, যদিও প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম) অনেক আগে থেকেই ঐশী প্রকাশ (ওহী) পেয়ে আসছিলেন, কিন্তু যে ওহীতে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে তাঁকে মানবজাতির সংস্কারের জন্য নিযুক্ত করেন, সেই ওহী তিনি ১৮৮২ সালের মার্চ মাসে লাভ করেন, যখন তিনি বরাহীন আহমদিয়ার তৃতীয় খণ্ড লিখছিলেন (দেখুন বরাহীন আহমদিয়া, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৮)।

তবে সেই সময় তিনি বাই'আতের (শিষ্যত্ব গ্রহণের) ব্যবস্থা চালু করেননি, বরং আরও ঐশী নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলেন। তদনুসারে, যখন আল্লাহর নির্দেশ প্রকাশিত হয়, তখন তিনি ১৮৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসে বাই'আত গ্রহণের ঘোষণা দেন এবং একটি প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে মানুষকে আমন্ত্রণ জানান। তারপর ১৮৮৯ সালের প্রথম দিকে তিনি বাই'আত গ্রহণ শুরু করেন।

সেই পর্যায়েও তাঁর দাবি শুধু মুজাদ্দিদ (সংস্কারক) এবং ঐশী নিযুক্ত ব্যক্তি (মা'মুর) হিসেবেই ছিল। যদিও তাঁর ঐশী নিয়োগের দাবির শুরু থেকেই তাঁর ওহীসমূহে স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল যে তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ, তবুও ঐশী হিকমতের কারণে তিনি বেশ কিছুকাল প্রকাশ্যে প্রতিশ্রুত মসীহ বলে দাবি করেননি। বরং তিনি শুধু এটুকুই বলতে থাকেন যে, তিনি নাসারী ঈসা (আ.)–এর আদলে ও আত্মায় মানবজাতির সংস্কারের জন্য প্রেরিত হয়েছেন এবং তাঁর মধ্যে মসীহের সাদৃশ্য রয়েছে।

এরপর ১৮৯১ সালের শুরুর দিকে তিনি ঘোষণা করেন যে, নাসারী ঈসা (আ.) ইন্তেকাল করেছেন এবং তিনি নিজেই সেই মসীহ যাঁর আগমন এই উম্মাহর জন্য প্রতিশ্রুত ছিল। তাঁর বিরুদ্ধে প্রধান বিরোধিতার ঢেউ এই দাবি থেকেই শুরু হয়।

অনুরূপভাবে, নবী (নবী) ও রাসূল হিসেবে তাঁর দাবির স্পষ্ট ইঙ্গিত তাঁর পূর্ববর্তী ওহীসমূহে পাওয়া যায়। কিন্তু ঐশী হিকমত তাঁকে বিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত এই দাবি প্রকাশ্যে করতে বিরত রেখেছিল। এরপর তিনি নিজের জন্য নবী ও রাসূল শব্দগুলো স্পষ্টভাবে ব্যবহার শুরু করেন।

আর কৃষ্ণের প্রতিরূপ (মসীলে–ই–কৃষ্ণ বা কৃষ্ণসদৃশ) হিসেবে তাঁর দাবি আরও পরে, ১৯০৪ সালে প্রকাশিত হয়।

এসব কিছুই ঐশী নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণে ঘটেছে; নিজে থেকে এই সময়সূচী নির্ধারণে তাঁর কোনো ভূমিকা ছিল না। পবিত্র নবী (সা.)–এর জীবনেও অনুরূপ ক্রমশ প্রকাশ দেখা যায়। এই ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়ার পেছনে অনেক হিকমত রয়েছে, যদিও এখানে তা বিস্তারিত আলোচনার স্থান নয়।

১ম পাতার পর....

দ্বিতীয়ত: যখন এমন কোনো বিধান প্রণয়ন করা হবে, যা কেবল একজন ব্যক্তি বা একটি জাতির জন্য নয়, বরং বহু ব্যক্তি ও বহু জাতির জন্য প্রযোজ্য, তখন তা মানব প্রকৃতির সব ধরনের বৈচিত্র্যকে বিবেচনায় রাখবে এবং এমন নির্দেশনা দেবে, যার ওপর প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজস্ব সামর্থ্য অনুযায়ী আমল করতে পারে।

তৃতীয়ত:একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, তার বিধানসমূহ সমগ্র মানবজাতির জন্য বাস্তবায়নযোগ্য হতে হবে এবং তা ধর্ম, নৈতিকতা, বুদ্ধিবৃত্তি কিংবা সভ্যতার ক্ষেত্রে কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে না।

আল্লাহ তাআলা এই তিনটি উৎকর্ষই এই আয়াতে একত্রিত করেছেন। লক্ষ্য করো, আয়াতটি কত সংক্ষিপ্ত, অথচ কী সুন্দর ও সুশোভিতভাবে পূর্ণতার উভয় দিক–ইতিবাচক ও নেতিবাচক–এতে সংযোজিত হয়েছে।

এখানে তিনটি কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে– ১. আদল (ন্যায়বিচার) ২. ইহসান (অনুগ্রহ ও সদাচার) ৩. ঈতায়ে জিল–কুরবা (আত্মীয়–স্বজনের প্রতি ন্যায় স্নেহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন) এবং তিনটি বিষয় থেকে নিষেধ করা হয়েছে– ১. ফাহশা (অশ্লীলতা) ২. মুনকার (মন্দ ও নিন্দনীয় কাজ) ৩. বাগ্‌ই (সীমালঙ্ঘন, জুলুম ও অত্যাচার)। 'আদল' (ন্যায়বিচার)–এর অর্থ হলো সমতা। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি অন্যদের সঙ্গে সেইরূপ আচরণ করবে, যেরূপ আচরণ সে নিজে অন্যদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করে। যদি তার প্রতি অন্যায় করা হয়, তবে সে কেবল সেই অন্যায়ের সমপরিমাণ প্রতিকার নিতে পারে; কিন্তু তার সীমা অতিক্রম করতে পারে না। আর যদি কেউ তার সঙ্গে সদাচরণ করে, তবে তার কর্তব্য হলো অন্তত একই পরিমাণ সদাচরণ ফিরিয়ে দেওয়া। (তাফসীরে কবীর, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৬৮)

অস্ট্রেলিয়া সফর (২০১৩)

রয়্যাল বোটানিক গার্ডেনে সফর

আজ মেলবোর্ন জামাআতের পক্ষ থেকে মেলবোর্ন ও তার আশপাশের কিছু স্থান পরিদর্শনের একটি কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছিল। দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে হযরত আমীরুল মুমিনীন, খলিফাতুল মসীহ পঞ্চম (আল্লাহ তাঁর সাহায্য দ্বারা তাঁকে শক্তিশালী করুন) তাঁর বাসস্থান থেকে বের হন। তিনি দুপুর ১২টা ৫০ মিনিটে রয়্যাল বোটানিক গার্ডেনস-এ পৌঁছান। এরপর হযরত আমীরুল মুমিনীন প্রায় এক ঘণ্টা বাগানটিতে পদচারণা করেন।

এই বাগানের বিশেষত্ব হলো, এখানে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া যায় এমন প্রায় সব ধরনের বৃক্ষ, উদ্ভিদ ও ফুল সংরক্ষিত রয়েছে। এ কারণে বাগানটি নানাবিধ বৃক্ষ এবং রঙিন ও দৃষ্টিনন্দন গাছপালা ও ফুলে সুশোভিত। বাগানের বিভিন্ন স্থানে প্রাকৃতিক হ্রদও নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন পর্বতাঞ্চল থেকে আনা বড় বড় পাথর সেখানে স্থাপন করা হয়েছে, যা বাগানের সৌন্দর্যকে আরও বৃদ্ধি করেছে।

এই বাগানটি ১৯১০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে মোট ১৭০ প্রজাতির ১,৭০,০০০ গাছপালা রয়েছে। বনাঞ্চল, পার্বত্য অঞ্চল এবং মরুভূমি এলাকায় জন্মানো উদ্ভিদসমূহও সংগ্রহ করে এই বাগানে রোপণ করা হয়েছে।

কর্মসূচি অনুযায়ী, বাগানের অভ্যন্তরে অবস্থিত একটি হলে যোহর ও আসরের নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দুপুর ২টায় হযরত আমীরুল মুমিনীন যোহর ও আসরের নামাজ একত্রে আদায় করান।

মাউন্ট ড্যান্ডেনং সফর

এরপর কাফেলা মনোরম পাহাড়ি পর্যটনকেন্দ্র স্কাইহাই মাউন্ট ড্যান্ডেনং-এর দিকে রওনা হয়। পথে "দ্য হিলজ কিচেন নামক একটি রেস্তোরাঁয় বিরতি নেওয়া হয়, যেখানে মধ্যাহ্নভোজ পরিবেশন করা হয়। এরপর কাফেলা পুনরায় যাত্রা শুরু করে এবং বিকেল ৪টা ৫০ মিনিটে মাউন্ট ড্যান্ডেনং-এ পৌঁছায়। এটি একটি উঁচু স্থান, যেখান থেকে মেলবোর্ন শহর এবং তার সুউচ্চ ভবনগুলোর চমৎকার দৃশ্য উপভোগ করা যায়।

হযরত আমীরুল মুমিনীন এই স্থানে প্রায় ২৫ মিনিট অবস্থান করেন। তিনি বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করেন এবং ভিডিও ধারণও করেন।

এরপর বিকেল ৫টা ২০ মিনিটে কাফেলা সেখান থেকে রওনা হয়ে ৫টা ৪০ মিনিটে ড্যান্ডেনং রেঞ্জেস ন্যাশনাল পার্ক-এ পৌঁছায়।

অস্ট্রেলিয়ায় হলুদ ঝুঁটিযুক্ত সাদা ককাটুয়া পাখি পাওয়া যায়। এছাড়া বিভিন্ন রঙের মনোরম সমন্বয়ে গঠিত আরও অনেক সুন্দর প্রজাতির টিয়া পাখি অস্ট্রেলিয়ায় প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। এই জাতীয় উদ্যানটি এসব টিয়া পাখির আবাসস্থল। তাদের খাদ্য প্রদানের জন্য সেখানে একটি বিশেষ এলাকা নির্ধারিত রয়েছে।

হযরত আমীরুল মুমিনীন (আই.) অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে এই পাখিগুলোকে নিজের হাতে ধরে সূর্যমুখীর বীজ খাওয়ান। রঙিন টিয়া পাখিগুলো হযরত আমীরুল মুমিনীনের কাছে এসে তাঁর কব্জির ওপর বসত এবং তাঁর হাতের তালু থেকে বীজ খেত। তিনি যখন তাদের ডাকতেন, তখন তারা উড়ে এসে তাঁর কব্জিতে বসত এবং খাদ্য গ্রহণ শুরু করত। প্রায় আধা ঘণ্টা ধরে পার্কে বসবাসকারী এই পাখিগুলোকে হযরত আমীরুল মুমিনীন স্নেহভরে খাদ্য প্রদান করেন এবং তারা তাঁর এই অনুগ্রহ থেকে উপকৃত হয়।

এরপর কাফেলা **আহমদিয়া সেন্টার মেলবোর্ন**-এ ফিরে আসে। হযরত আমীরুল মুমিনীন সন্ধ্যা ৭টায় আহমদিয়া সেন্টারে পৌঁছান এবং কিছু সময়ের জন্য তাঁর আবাসিক কক্ষে গমন করেন।

ওয়াক্‌ফে নও শিশুদের ক্লাস

কর্মসূচি অনুযায়ী সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে হযরত আমীরুল মুমিনীন, খলিফাতুল মসীহ পঞ্চম (আল্লাহ তাঁর সাহায্য দ্বারা তাঁকে শক্তিশালী করুন) মসজিদের হলে আগমন করে সমবেতদের ধন্য করেন। সেখানে মেলবোর্নের ওয়াক্‌?ফে নও শিশুদের সঙ্গে হযরত আমীরুল মুমিনীনের ক্লাস শুরু হয়।

অনুষ্ঠানটি শুরু হয় প্রিয় মুবাশশির আহমদের পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে। এরপর এর ইংরেজি অনুবাদ উপস্থাপন করেন প্রিয় ইবরাহিম সাঈদ।

এরপর প্রিয় মুস্তফা আহমদ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিম্নোক্ত হাদিসটি উপস্থাপন করেন:

"আকরিমু আওলাদাকুম ওয়া আহসিনু আদাবাহুম"

এবং প্রিয় মুস্তফা আহমদ এর অনুবাদ করেন:

"তোমাদের সন্তানদের সম্মান করো এবং তাদের সর্বোত্তম শিক্ষা ও চরিত্রগঠন দাও।"

এরপর প্রিয় রেহান আহমদ মাজোকা সুরেলা কণ্ঠে হযরত মির্জা গোলাম আহমদ, প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর নিম্নোক্ত শের আবৃত্তি করেন-

এক না এক দিন পেশ হবে তু ফানা কে সামনে
চল নেহি সকতি কিসি কি কুছ কাজা কে সামনে

অর্থ:একদিন না একদিন তোমাকে ধ্বংস ও মৃত্যুর সম্মুখীন হতেই হবে;
নিয়তির সামনে কারও কোনো শক্তিই কার্যকর হতে পারে না।

এরপর প্রিয় ইহসান সাফির আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর রচনাবলি থেকে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি পাঠ করেন-

"যখন কোনো ব্যক্তি আল্লাহর হয়ে যায় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির মধ্যেই সমস্ত আরাম ও আনন্দ খুঁজে পায়, তখন নিঃসন্দেহে তার জীবনে কষ্টের দিনও আসে। কিন্তু তার আরামের পথ ভিন্ন হয়ে যায়। তখন সে দুনিয়া ও তার ভোগ-বিলাসে কোনো আনন্দ বা প্রশান্তি খুঁজে পায় না। একইভাবে, দুনিয়াকে নবী ও অলীদের পদতলে এনে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তারা তা থেকে কোনো উপভোগ গ্রহণ করেননি, কারণ তাদের দৃষ্টি অন্যত্র নিবদ্ধ ছিল। এটাই প্রকৃতির বিধান।

মানুষ যখন দুনিয়ার সুখ-সুবিধার পেছনে দৌড়ায়, তখন সে তা লাভ করতে পারে না। কিন্তু যখন সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য নিবেদিত হয়ে যায়, দুনিয়ার ভোগবিলাস ত্যাগ করে এবং তার প্রতি কোনো আকাঙ্ক্ষা অবশিষ্ট রাখে না, তখন দুনিয়া নিজেই তার কাছে আসে, কিন্তু তার মোহ আর থাকে না। এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি, যা কখনো ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

দুনিয়ার প্রাপ্তি আল্লাহর প্রাপ্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আল্লাহ তাআলা বারবার ঘোষণা করেছেন যে, যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করবে, তাকে তিনি সকল সংকট ও কঠিন অবস্থা থেকে মুক্তি দেবেন এবং এমন উৎস থেকে রিযিক দান করবেন, যার ধারণাও সে করতে পারবে না।

কতই না বড় অনুগ্রহ ও নিয়ামত যে, মানুষ সকল প্রকার কষ্ট ও বিপদ থেকে রক্ষা পায় এবং স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তার রিযিকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তবে আল্লাহ নিজেই বলেছেন যে, এই নিয়ামত তাকওয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কোথাও তিনি বলেননি যে, দুনিয়াবি প্রতারণা, চাতুর্য বা কূটকৌশলের মাধ্যমে এসব অর্জন করা যায়।

আল্লাহর বান্দাদের অন্যতম লক্ষণ এই যে, তাদের অন্তরে দুনিয়ার প্রতি স্বাভাবিক অনাগ্রহ থাকে। অতএব, যে ব্যক্তি চায় আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং সে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে শান্তি লাভ করুক, তার উচিত এই পথ অবলম্বন করা।

আর যদি সে এই পথ পরিত্যাগ করে অন্য পথ গ্রহণ করে, তবে সে যতই চেষ্টা করুক না কেন, কিছুই লাভ করতে পারবে না। অনেকেই এই উপদেশকে অপছন্দ করবে এবং উপহাস করবে। কিন্তু তারা স্মরণ রাখুক, এমন এক সময় অবশ্যই আসবে যখন তারা এসব কথার বাস্তবতা উপলব্ধি করবে এবং আর্তনাদ করে বলবে, 'হায়! আমরা আমাদের জীবন বৃথাই নষ্ট করেছি।'

কিন্তু তখনকার অনুতাপ কোনো উপকারে আসবে না। প্রকৃত সুযোগ তখন হাতছাড়া হয়ে যাবে এবং মৃত্যুর বার্তা এসে পৌঁছাবে।"

(মালফুযাত, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ১৯৫)

এরপর হযরত আমীরুল মুমিনীন (আই.) শিশুদেরকে সদ্য পাঠ করা প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর উদ্‌ধৃতিটির সারমর্ম বর্ণনা করতে বলেন।

হযরত আমীরুল মুমিনীন বলেন যে, শুধুমাত্র আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে এবং আল্লাহকে পেতে পারে। আর যখন কেউ আল্লাহকে লাভ করে, তখন সে দ্বীনও লাভ করে, দুনিয়াও লাভ করে। কিন্তু যারা শুধু দুনিয়ার পেছনে ছুটে বেড়ায়, তারা না দ্বীন পায়, না দুনিয়া পায়।

এ প্রসঙ্গে হযরত আমীরুল মুমিনীন নিম্নোক্ত শেরটিও আবৃত্তি করেন-

না খুদা হি মিলা, না বিসাল-এ-সানাম
না ইধার কে রহে, না উধার কে রহে

অর্থ: না আল্লাহকে পাওয়া গেল, না প্রিয়তমকে;
না এদিকের রইল, না ওদিকের রইল।

এরপর হযরত আমীরুল মুমিনীন যেসব ওয়াক্‌?ফে নও সদস্য তাদের শিক্ষা সম্পন্ন করেছে, তাদের জিজ্ঞাসা করেন যে তারা কি লিখিত আবেদনপত্র জমা দিয়েছে এবং জীবন উৎসর্গ করে সেবার জন্য নিজেদের পেশ করেছে কি না।

হযরত আমীরুল মুমিনীন বলেন: "যখন তোমরা তোমাদের সমগ্র জীবন ওয়াক্‌?ফ করে দিয়েছ, তখন ওয়াক্‌?ফের অর্থ হলো-আমরা তোমাদের যেখানে পাঠাতে চাই, সেখানে তোমাদের যেতে হবে।"

ওয়াক্‌ফে নওদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর পর্ব

যুগ খলীফার বাণী

কঠিন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের একটিই পথ- আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নতজানু হও। (খুতবা, জুমআ, ১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: Late Shohrae Alam & Alia Bibi
From-Mahmood Alam Sb. Barisha, 24 PGS (s)

হযরত আমীরুল মুমিনীন, খলিফাতুল মসীহ পঞ্চম (আল্লাহ তাঁর সাহায্য দ্বারা তাঁকে শক্তিশালী করুন) সস্নেহে ওয়াক্‌ফে নও সদস্য, যুবক ও শিশুদের প্রশ্ন করার অনুমতি প্রদান করেন।

এক শিশু প্রশ্ন করল: "হযরত আমীরুল মুমিনীন কি জুমার খুতবা নিজেই প্রস্তুত করেন?

জবাবে হযরত আমীরুল মুমিনীন বলেন: "আমি নিজেই খুতবা প্রস্তুত করি এবং রেফারেন্সগুলোও নিজেই বের করি। যদি কোনো রেফারেন্স টাইপ বা প্রিন্ট করার প্রয়োজন হয়, তখন আমি আমার অফিসকে আনুষ্ঠানিকভাবে রেফারেন্সের পৃষ্ঠাসংখ্যা, বইয়ের নাম এবং সুনির্দিষ্ট উদ্‌ধৃতি জানিয়ে দিই, যাতে তারা সেটি টাইপ বা ফটোকপি করতে পারে।"

একজন ওয়াক্‌?ফে নও সদস্য জানালেন যে তিনি পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে অধ্যয়নরত।

হযরত আমীরুল মুমিনীন বলেন: "তোমার পিএইচ.ডি. সম্পন্ন হলে আমাদের জানাবে এবং নিজেকে পেশ করবে। এরপর কোথায় তোমাকে সেবার জন্য নিয়োগ করা হবে, সে সিদ্ধান্ত আমাদের হবে। এটাও বলা যেতে পারে যে তুমি নিয়মিত ওয়াক্‌?ফের অন্তর্ভুক্ত, তবে আপাতত তুমি তোমার নিজের কাজ চালিয়ে যেতে পার।"

হযরত আমীরুল মুমিনীন আরও ব্যাখ্যা করেন: "এখানে কেবল দুটি পরিস্থিতি রয়েছে। শিক্ষা সম্পন্ন করার পর ওয়াক্‌?ফে নও সদস্যরা আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের পেশ করবে এবং সেবার জন্য উপস্থিত হবে। এরপর তারা পূর্ণকালীন ওয়াক্‌?ফের জীবন যাপন করবে। দ্বিতীয় পরিস্থিতি হলো, যারা নিজেদের পেশ করবে না এবং নিজস্ব পেশা বা কাজ শুরু করবে, তারা ওয়াক্‌?ফে নও থেকে অব্যাহতি পাবে এবং তাদের ওয়াক্‌?ফের অঙ্গীকারের সমাপ্তি ঘটবে।"

এক শিশু প্রশ্ন করল: "আমরা কি ম্যাকডোনাল্ডস বা এ ধরনের রেস্তোরাঁর ফাস্ট ফুড খেতে পারি?

জবাবে হযরত আমীরুল মুমিনীন বলেন: "এসব স্থানে একই তেলে মুরগি, মাছ, শূকরের মাংস ইত্যাদি ভাজা হয়। তাই খোঁজ নেওয়া জরুরি যে এগুলো কি একই তেলে ভাজা হচ্ছে কি না। যদি তাই হয়, তাহলে সেখানে খাওয়া উচিত নয়। যাই হোক, এসব জিনিস থেকে দূরে থাকাই উত্তম।"

তিনি আরও বলেন: "এগুলোর কোনো অপরিহার্য প্রয়োজন নেই। তাই খেও না এবং সতর্ক থাকো।" তিনি আরও যোগ করেন: "যদি তাদের আলাদা তেলে রান্না করতে বলা হয়, তবে তারা অনেক সময় সেভাবেই প্রস্তুত করে দেয়।"

তাবলিগ সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে হযরত আমীরুল মুমিনীন বলেন:

"আমি নির্দেশ দিয়েছি যে দেশের অন্তত ১০ শতাংশ মানুষের কাছে আহমদিয়াতের বার্তা পৌঁছানো উচিত–অন্তত লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে হলেও। যেন দেশের মোট জনসংখ্যার অন্তত ১০ শতাংশের কাছে এই বার্তা পৌঁছে যায়। মেলবোর্নের জনসংখ্যা ৪০ লক্ষ। অন্তত তাদের ১০ শতাংশের কাছে আহমদিয়াতের বার্তা পৌঁছে দাও।"

তিনি আরও বলেন: "অস্ট্রেলিয়ায় তাসমানিয়া নামে একটি দ্বীপ রয়েছে। সেখানে যাও, বার্তা পৌঁছাও, তাবলিগ করো এবং দীর্ঘ সময় অবস্থান করো। মাত্র কয়েক দিনের অবস্থানে তেমন ফল হয় না। সেখানকার মানুষ ধর্মের প্রতি তুলনামূলকভাবে বেশি আগ্রহী। এখানকার খুদ্দামদের উচিত অস্থায়ী ওয়াক্‌ফ হিসেবে সেখানে গিয়ে কাজ করা।"

হযরত আমীরুল মুমিনীন উল্লেখ করেন যে জার্মানির খুদ্দামরা ১৫ লক্ষ পুস্তিকা বিতরণ করেছে।

তিনি বলেন:" তোমাদেরও তাবলিগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।"

ফেসবুক সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে হযরত আমীরুল মুমিনীন বলেন:

"তাবলিগের উদ্দেশ্যে 'আল ইসলাম' ওয়েবসাইটের যে ফেসবুক পেইজ রয়েছে, সেটিই ব্যবহার করো। ব্যক্তিগত ফেসবুক অ্যাকাউন্ট তৈরি ও ব্যবহার করার অনুমতি নেই। তবে যদি খুদ্দামুল আহমদিয়া কোনো পৃষ্ঠা তৈরি করতে চায় এবং সেটিকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করতে পারে, তাহলে অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু যেসব খুদ্দাম এখনো পরিপক্ব নয়, তারা ভুল করতে পারে বা অপব্যবহার করতে পারে। তাই সরকারি 'আল ইসলাম' ফেসবুক পেইজ ব্যবহার করা উত্তম।"

লিফলেট প্রস্তুত করা সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে হযরত আমীরুল মুমিনীন বলেন: "আজকাল মানুষ ধর্ম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর অস্তিত্বেই বিশ্বাস করে না, ধর্মে তার কোনো আগ্রহ থাকে না। তাই এ ধরনের মানুষের জন্য লিফলেট ও বার্তায় প্রথমে আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরতে হবে। আগে তাকে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত করো। এমন লিফলেট তৈরি করো যা প্রথমে আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে তাকে সন্তুষ্ট করে।"

এ প্রসঙ্গে হযরত আমীরুল মুমিনীন একটি ঘটনা বর্ণনা করেন: "বেলজিয়ামে একজন ইন্দোনেশীয় বন্ধু বায়আত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না। আমাদের একজন মুবাল্লিগ তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর মধ্যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস সৃষ্টি হয় এবং তিনি নিশ্চিত হন যে আল্লাহ আছেন। যখন তিনি আল্লাহকে মেনে নিলেন, তখন বললেন যে এখন একটি ধর্ম গ্রহণ করাও প্রয়োজন। তিনি মুবাল্লিগকে বললেন, 'যেহেতু আপনি আমাকে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত করেছেন, তাই আমি আপনার আহমদিয়া জামাআতে যোগ দিচ্ছি।' এভাবেই তিনি আহমদিয়াত গ্রহণ করেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন বেলজিয়ান।"

এক ছাত্র প্রশ্ন করল: "যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, তারা বলে–যদি সব কিছুর একজন স্রষ্টা থাকে, তাহলে সেই স্রষ্টাকে কে সৃষ্টি করেছে?

জবাবে হযরত আমীরুল মুমিনীন বলেন: "আমাদের এই পৃথিবী গঠিত হতে কোটি কোটি বছর লেগেছে। এই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এমন এক সত্তাকে স্বীকার করতেই হবে, যিনি নিজে কারও দ্বারা সৃষ্ট নন। কোথাও না কোথাও গিয়ে তোমাকে থামতেই হবে। যেখানে গিয়ে তুমি থামবে, সেটিই আমাদের আল্লাহ।"

তিনি আরও বলেন: "হযরত মির্জা বশীর আহমদ সাহেবের *'হামারা খুদা'* (আমাদের আল্লাহ) বইটি পড়ো। এর ইংরেজি অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে।"

তিনি আরও বলেন: "আল্লাহর অস্তিত্বের অন্যতম বড় প্রমাণ হলো দোয়া কবুল হওয়া–যখন আমি দোয়া করি এবং আল্লাহ তা কবুল করেন।"

এরপর তিনি একটি উদাহরণ দেন: "একজন মহিলা এক মেয়েকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যে আল্লাহতে বিশ্বাস করত না–'তুমি যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষায় অংশ নিতে যাও এবং পথে কোনো বাধার সম্মুখীন হও, দেরি হয়ে যায়, আর সময়মতো পৌঁছানো কঠিন মনে হয়, তখন তুমি কী করবে?'

মেয়েটি উত্তর দিল, 'আমি আশা রাখব।

তখন মহিলা বললেন, 'তাহলে শেষ পর্যন্ত তুমি কোনো না কোনো সত্তার ওপরই আশা রাখবে। যার ওপর তুমি আশা রাখছ, তিনিই আল্লাহ।'

তখন মেয়েটি বলল, 'আমি এ বিষয়ে চিন্তা করব।'

হযরত আমীরুল মুমিনীন পরামর্শ দেন:

ইসলামের শিক্ষা দর্শন (The Philosophy of the Teachings of Islam) পড়ো।"

এছাড়াও তিনি বলেন: "হযরত খলিফাতুল মসীহ চতুর্থ (রহ.)–এর *Revelation, Rationality, Knowledge and Truth' গ্রন্থের ৫ম ও ৬ষ্ঠ অধ্যায়ও পড়ো।"

তিনি আরও বলেন:" তোমার নিজের যদি আল্লাহ সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকে, তাহলে তুমি কোনো নাস্তিককে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্তুষ্ট করতে পারবে না।"

এক ছাত্রের প্রশ্নের জবাবে হযরত আমীরুল মুমিনীন বলেন যে এখানে একটি "আহমদিয়া মুসলিম স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন"(AMSA) প্রতিষ্ঠা করা উচিত।

তিনি বলেন:

"খুদ্দামুল আহমদিয়ার 'মুহতামিম উমুরে তুলাবা' এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত। তাঁর অধীনে এবং স্থানীয় সেক্রেটারি তালিমের তত্ত্বাবধানে এটি পরিচালিত হওয়া উচিত। বিশ্বের বহু বড় দেশে এই সংগঠন রয়েছে। এটি একটি অত্যন্ত পুরোনো সংগঠন। আমি নিজে যখন ফয়সালাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতাম, তখন এর সহ-সভাপতি ছিলাম। বিভিন্ন দেশে এটি AMSA নামেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তোমাদেরও এখানে এটি প্রতিষ্ঠা করা উচিত। জার্মানিতে ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক সংগঠন রয়েছে। তোমাদেরও এখানে তা প্রতিষ্ঠা করা উচিত।"

আরেকটি প্রশ্নের জবাবে হযরত আমীরুল মুমিনীন বলেন:

"যারা ওয়াক্‌ফে নও এবং পনেরো বছর বয়সের পর নিজেদের ওয়াক্‌?ফ হিসেবে পেশ করেছে, তাদের উচ্চশিক্ষার কোনো ক্ষেত্র নির্বাচন করার আগে অবশ্যই মারকাযের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। মারকায জানিয়ে দেবে কোন কোন পেশার প্রয়োজন রয়েছে। যদি তোমরা প্রস্তাবিত ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোনো বিষয় অধ্যয়ন করতে চাও, তাহলে আগে মারকাযের অনুমতি নিতে হবে।"

হযরত আমীরুল মুমিনীন আরও বলেন:

"তোমরা ওয়াক্‌ফে নও হও বা ওয়াক্‌ফে জিন্দেগি হও, এবং যে পেশাতেই থাকো না কেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা, প্রতিদিন নিয়মিত পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করা এবং ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা অত্যাবশ্যক। তোমাদের ধর্মীয় জ্ঞান ক্রমাগত বৃদ্ধি করতে হবে। তোমরা যে ক্ষেত্রেই থাকো না কেন, ধর্মীয় জ্ঞানের দিক থেকে নিজেদেরকে সুপ্রস্তুত করতে হবে।"

ওয়াক্‌ফে নওদের এই ক্লাস রাত ৮টা ২০ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

(সৌজন্যে: আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ২৮ শে নভেম্বর, ২০১৩)

যুগ খলীফার বাণী

প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে। এবং নিশ্চয় কিয়ামতের দিনই কেবল তোমাদিগকে তোমাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হইবে। (আলে ইমরান: ১৮৬)

দোয়াপ্রার্থী: Humayun Kabir Molla, Nalhati, Birbhum

সীরাত খাতামান্নবীঈন

হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ

হযরত ইসমাঈল ও হযরত হাজেরার সম্বন্ধে কতিপয় আপত্তির জবাব

সংক্ষেপে বলা যায়, তাঁকে দাসী বলে অভিযোগ করা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা ও অসত্য। তথাপি, যদি যুক্তির খাতিরে ধরেও নেওয়া হয় যে দাসত্ব প্রমাণিত, তবুও এইরূপ দাসত্ব নিশ্চয়ই কোনো কলঙ্ক বা অপমানের কারণ নয় যা একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে জোরপূর্বক তাহার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করে কারাগারে নিক্ষেপ করার যৌক্তিকতা প্রদান করে–যেমন সেকালে সাধারণত প্রচলিত ছিল।

যদি এটিকেই দাসত্ব বলে গণ্য করা হয়, তবে পৃথিবীর কোনো শ্রদ্ধেয় ও স্বাধীন জাতি এই দাসত্বের কলঙ্ক হইতে মুক্ত বলিয়া বিবেচিত হতে পারে না। বনী ইসরাইল জাতি নিজেই দীর্ঘকাল যাবৎ–প্রথমে মিশরে এবং পরে ব্যাবিলনে–দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল।

তথাপি, এই কারণে বনী ইসরাইলের নবীগণ ও রাজাগণকে "দাসজাত" বলে অভিহিত করা যায় না। তেমনই, হযরত সারা (আ.)–এর মিশরের রাজার হারেমে সাময়িকভাবে আবদ্ধ থাকা অথবা হযরত ইউসুফ (আ.)–এর মিশরের আজিজের গৃহে দাস হিসাবে জীবনযাপন–কোনো ইসরাইলী বংশধরের জন্য নিন্দা বা তিরস্কারের বিষয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

অতএব, বিষয়টি অনুধাবন করুন (ফাফহাম)।

কাবা ঘরের নির্মাণ

এই গৌণ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার পর আমরা আবার আমাদের মূল বিষয়ের দিকে ফিরে আসি।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্? তাআলার নির্দেশে হযরত ইবরাহীম (আ.) হযরত হাজেরা (আ.) এবং তাঁর প্রিয় পুত্রকে মক্কার অনুর্বর উপত্যকায় এনে বসতি স্থাপন করান এবং তারপর নিজ দেশে ফিরে যান। হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার আরবে আসেন, তখন হযরত হাজেরা (আ.) ইতোমধ্যে ইন্তেকাল করেছিলেন। ঘটনাক্রমে উভয়বারই হযরত ইসমাঈল (আ.) ঘরে উপস্থিত ছিলেন না। ফলে পিতা–পুত্রের সাক্ষাৎ সম্ভব হয়নি। তাই হযরত ইবরাহীম (আ.) চতুর্থবার আরবে আগমন করেন। এই সফরেই পিতা ও পুত্র মিলে মক্কায় একটি উপাসনালয় নির্মাণের কাজ শুরু করেন।

প্রকৃতপক্ষে এই উপাসনালয়টি অত্যন্ত প্রাচীন ছিল, কিন্তু তার সমস্ত চিহ্ন মুছে গিয়েছিল। আল্লাহ্? তাআলার পক্ষ থেকে জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.) সেটিকে নতুন করে পুনর্নির্মাণের প্রস্তাব করেন। হযরত ইসমাঈল (আ.) নির্মাণকাজে তাঁকে সহায়তা করেন এবং তাঁর জন্য পাথর এনে দিতেন। যখন দেয়াল কিছুটা উঁচু হয়ে যায়, তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) একটি বিশেষ পাথর এনে কাবা ঘরের এক কোণে স্থাপন করেন, যাতে তা মানুষের জন্য একটি চিহ্ন হিসেবে কাজ করে এবং তারা বুঝতে পারে যে, বায়তুল্লাহর তাওয়াফ সেই স্থান থেকেই শুরু করতে হবে। এই পাথরটিই হলো **হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর)**, যাকে হজের সময় তাওয়াফকালে হাজীরা চুম্বন করেন অথবা হাতের ইশারায় তার দিকে নির্দেশ করেন।

তবে মনে রাখা উচিত যে, হাজরে আসওয়াদ নিজে কোনো পবিত্র সত্তা নয় এবং তাওয়াফের সময় তাকে চুম্বন করাকে কোনোভাবেই শিরক বলা যায় না। এটি কেবল একটি প্রতীক বা নিদর্শনমাত্র। প্রকৃত পবিত্রতা নিহিত রয়েছে কাবা ঘরকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত পবিত্র ঐতিহ্য ও স্মৃতির মধ্যে।

এ প্রসঙ্গে একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার দ্বিতীয় খলীফা টসধৎ রনহ ধষ–কযধঃঃধন (রা.) কাবা শরীফ তাওয়াফ করছিলেন। তিনি হাজরে আসওয়াদের দিকে মুখ করে বললেন–

"হে পাথর! আমি জানি, তুমি কেবল একটি পাথর মাত্র। তুমি কারো উপকার বা অপকার করার কোনো ক্ষমতা রাখো না। যদি আমি আল্লাহর রাসূল (সা.)–কে তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম, তবে আমিও কখনো তোমাকে চুম্বন করতাম না।"

আরও উল্লেখযোগ্য যে, তাওয়াফের সময় শুধু হাজরে আসওয়াদ–সংবলিত কোণটিই চুম্বন করা হয় না; তার সংলগ্ন আরেকটি কোণও চুম্বন করা হয়। বাকি দুই কোণ চুম্বন করা হয় না, কারণ 'হাতীম'–এর জন্য সেগুলো তাদের মূল অবস্থানে নেই। এই দৃষ্টিকোণ থেকেও হাজরে আসওয়াদের কোনো একক বা স্বতন্ত্র মর্যাদা প্রমাণিত হয় না।

সংক্ষেপে, হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.) যৌথভাবে অপরিশোধিত পাথর দিয়ে একটি চতুষ্কোণ, ছাদবিহীন স্থাপনা নির্মাণ করেছিলেন। এর উচ্চতা ছিল নয় হাত, দৈর্ঘ্য বত্রিশ হাত এবং প্রস্থ বাইশ হাত। এটাই সেই কাবা ঘর, যা আজ সমগ্র মানবজাতির জন্য কেন্দ্রবিন্দু ও ঐক্যের প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

মহানবী (সা.)–এর আগমন

মহানবী (সা.)–এর আবির্ভাব ছিল সেই আন্তরিক দোয়ারই ফল। নবী করীম ? প্রায়ই বলতেন– "আমি ইবরাহীমের দোয়ার ফল।"

হজের ঘোষণা

কাবা ঘরের নির্মাণ সম্পন্ন হলে আল্লাহ্ তাআলা হযরত ইবরাহীম (আ.)–কে নির্দেশ দিলেন–

"আর আমার গৃহকে তাদের জন্য পবিত্র রাখো, যারা তাওয়াফ করে, যারা সেখানে ইবাদতের উদ্দেশ্যে অবস্থান করে এবং যারা রুকু ও সিজদা করে। আর মানুষের মধ্যে হজের ঘোষণা করে দাও। তারা তোমার কাছে পদব্রজে এবং প্রত্যেক ক্ষীণকায় উটের পিঠে আরোহণ করে দূর–দূরান্তের পথ অতিক্রম করে এসে উপস্থিত হবে।"

এই ঘোষণার মাধ্যমেই কাবা ঘরকে উপাসনার কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপিত হয়। আমরা দেখি, এর কিছুদিন পরই কাবা সমগ্র আরব উপদ্বীপের প্রধান ধর্মীয় কেন্দ্র হয়ে ওঠে এবং আরবের বিভিন্ন দূরবর্তী অঞ্চল থেকে মানুষ হজ পালনের জন্য সেখানে আসতে শুরু করে।

কাবার তত্ত্বাবধান (তাওলিয়াতে কাবা)

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মক্কায় সর্বপ্রথম স্থায়ীভাবে বসবাসকারী গোত্র ছিল জুরহুমে সানিয়াহ। হযরত ইসমাঈল (আ.) তাদের প্রধান মুদাদ ইবনে আমরের কন্যাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহ থেকে তাঁর বারো জন সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল নাবত এবং তার পরের পুত্রের নাম ছিল কিদার।

আরবদের অধিকাংশই কিদার ইবনে ইসমাঈলের বংশধর। কুরাইশ গোত্রও কিদারের বংশের অন্তর্ভুক্ত।

যতদিন হযরত ইসমাঈল (আ.) জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনিই কাবা ঘরের তত্ত্বাবধায়ক (মুতাওয়াল্লি) ছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র নাবত এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নাবতের মৃত্যুর পর কাবার তত্ত্বাবধান নাবতের মাতামহ মুদাদ ইবনে আমরের হাতে অর্পিত হয় এবং দীর্ঘকাল ধরে এটি জুরহুম গোত্রের কাছেই থাকে।

কিন্তু বহু বছর পরে বনী কাহতানের একটি শাখা, অর্থাৎ খুযাআহ গোত্র, জুরহুম গোত্রের ওপর প্রাধান্য লাভ করে এবং তাদের কাছ থেকে কাবার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ছিনিয়ে নেয়।

জুরহুম গোত্র মক্কা থেকে বিতাড়িত হওয়ায় অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিল। তারা ইয়েমেনের দিকে চলে যায়। তবে বিদায়ের আগে তাদের নেতা আমর ইবনুল হারিস গোত্রের সমস্ত মূল্যবান ধন–সম্পদ জমজম কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করেন এবং উপরিভাগ বন্ধ করে দেন।

ফলে যখন খুযাআহ গোত্র মক্কায় প্রবেশ করে, তখন এই পবিত্র ঝরনাটি সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। এটি শত শত বছর গোপন অবস্থায় ছিল–অবশেষে মহানবী (সা.)–এর দাদা আব্দুল মুত্তালিব তা পুনরাবিষ্কার করেন এবং পুনরায় এর প্রবাহ চালু করেন।

যাই হোক, জুরহুম গোত্রের পর খুযাআহ গোত্রই মক্কার শাসক এবং কাবার তত্ত্বাবধায়ক হয়ে ওঠে।

কাবায় মূর্তিপূজার প্রচলন

কাবা ঘরে মূর্তিপূজার প্রচলনের কৃতিত্ব (বা দায়) খুযাআহ গোত্রের প্রধান অসৎ ibn Luhayy–এর ওপর আরোপ করা হয়।

তিনি যখন শাম (সিরিয়া) সফরে যান, তখন সেখানে মূর্তিপূজকদের মূর্তি উপাসনা করতে দেখে তাঁর মনে এই আকাঙ্ক্ষা জন্ম নেয় যে, কাবা ঘরেও মূর্তি থাকা উচিত, যাতে মানুষ সেগুলোর উপাসনা করতে পারে। তাই তিনি শাম থেকে কয়েকটি মূর্তি এনে কাবা ঘরের চারপাশে স্থাপন করেন।

তৎকালীন সময়ে কাবা সমগ্র আরবের ধর্মীয় কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল এবং প্রতি বছর মানুষ সেখানে হজের জন্য সমবেত হতো। ফলে এই মাধ্যমেই মূর্তিপূজা ধীরে ধীরে সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

এর অর্থ এই নয় যে, এর আগে আরবের কোথাও মূর্তিপূজা ছিল না। বরং এর অর্থ হলো, কাবা ঘরে মূর্তি স্থাপিত হওয়ার ফলে আরবের সর্বত্র মূর্তিপূজার বিস্তার ও স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভের একটি বড় কারণ সৃষ্টি হয়েছিল।

ফলত, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শুধু কাবা ঘরেই মূর্তির সংখ্যা ধীরে ধীরে বেড়ে ৩৬০টি পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

দীর্ঘকাল পরে কাবার তত্ত্বাবধান খুযাআহ গোত্রের হাত থেকেও বেরিয়ে যায়। ঐতিহাসিকগণ এই ঘটনার বর্ণনায় একটি বিস্ময়কর কাহিনি উল্লেখ করেছেন, যার আলোচনা এখানে করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

কুসাই ইবনে কিলাব এবং কাবার তত্ত্বাবধানের প্রত্যাবর্তন

ফিহর ইবনে মালিকের বংশধরদের মধ্যে–অর্থাৎ কুরাইশ গোত্রে–খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে এক ব্যক্তি আবির্ভূত হন, যার নাম ছিল কুসাই ইবনে কিলাব। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ব্যক্তি।

যৌবনকালেই তাঁর অন্তরে এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্ম নিয়েছিল যে, মক্কার শাসনব্যবস্থা এবং কাবা ঘরের তত্ত্বাবধান প্রকৃতপক্ষে হযরত ইসমাঈল (আ.)–এর বংশধরদের ন্যায্য উত্তরাধিকার এবং তা অন্য কোনো জাতির হাতে থাকা উচিত নয়।

এই উদ্দেশ্যে তিনি মক্কায় আগমন করেন। ধীরে ধীরে নিজের প্রভাব–প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করতে করতে তিনি খুযাআহ গোত্রের প্রধান হুলাইল ইবনে হাবশিয়্যাহ আল–খুযাঈ–এর কন্যা হুব্বা কে বিবাহ করেন। সে সময় হুলাইলই কাবার তত্ত্বাবধায়ক এবং খুযাআহ গোত্রের প্রধান ছিলেন।

মৃত্যুশয্যায় হুলাইল অসিয়ত করেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর কাবার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাঁর কন্যা হুব্বা–যিনি কুসাইয়ের স্ত্রী–পাবেন। এভাবে কার্যত কাবার তত্ত্বাবধান কুসাইয়ের হাতে চলে আসে।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2026 -2028 Vol-11 Thursday, 11 June, 2026 Issue No.24

Act.
MANAGER
ATHAR AHMAD SHAMIM
Mob: +91 9815639670
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

সহায়তার কথা বলেন, অথচ প্রকৃত প্রয়োজন হলো যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং স্থায়ী শান্তির দিকে অগ্রসর হওয়া।

শান্তি সিম্পোজিয়ামের প্রচার সম্পর্কে তিনি বলেন: "এটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের যুগ। এর মাধ্যমে এই বার্তা লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব।"

খিলাফতের উপস্থিতির কারণে যুক্তরাজ্যের শান্তি সিম্পোজিয়ামের বিশেষ গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি বলেন: "এটির গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। বিভিন্ন দেশ থেকে অতিথিরা এসেছেন, যাদের মধ্যে মন্ত্রীরাও রয়েছেন। তারা সবাই একটি ইতিবাচক বার্তা নিয়ে নিজ নিজ দেশে ফিরে যাবেন।"

বড় দেশগুলোর দৃষ্টান্ত স্থাপনের প্রসঙ্গে তিনি বলেন: "যতদিন পর্যন্ত বড় দেশগুলো নেতৃত্ব প্রদর্শন করে শান্তির পথে এগিয়ে না আসবে, ততদিন ছোট দেশগুলোও তাদের অনুসরণ করবে।"

সম্মানিত ফরিদ আহমদ সাহেব

সেক্রেটারি ফরেন অ্যাফেয়ার্স, জামাআতে আহমদিয়া যুক্তরাজ্য

সম্মানিত ফরিদ আহমদ সাহেব গত ২০ বছরে ন্যাশনাল পিস সিম্পোজিয়ামের অগ্রগতি ও প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেন।

তিনি বলেন:"এই অনুষ্ঠান শুধু আকারে বড় হয়নি, বরং এর বার্তা ও প্রভাবও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।"

তিনি উল্লেখ করেন যে, বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষ এতে অংশগ্রহণ করে এবং হযরত খলিফাতুল মসীহের প্রদত্ত শান্তি, মানবতা ও সহমর্মিতার বার্তা থেকে দিকনির্দেশনা লাভ করে।

তিনি আরও বলেন: "এমটিএ-এর মাধ্যমে এই বার্তা সারা বিশ্বে পৌঁছে যাচ্ছে এবং এই অনুষ্ঠান বৈশ্বিক পর্যায়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠছে।" বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি বলেন: "বর্তমান যুগে সংঘাতগুলো আরও প্রকাশ্যভাবে সামনে আসছে। তাই হযরত খলিফাতুল মসীহ পূর্বের তুলনায় আরও স্পষ্ট ও সরাসরি ভাষায় শান্তি ও মানবতার পক্ষে আওয়াজ তুলছেন।"

ক্লেয়ার ডেসমন্ড

ক্রিশ্চিয়ান সলিডারিটি ওয়ার্ল্ডওয়াইড

তিনি বলেন: "এই অনুষ্ঠানটি একটি অভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পটভূমির মানুষকে একত্রিত করার একটি চমৎকার সুযোগ ছিল। এখানে বিভিন্ন মতামত শোনার সুযোগ হয়েছে এবং বিশেষভাবে হযরত আমীরুল মুমিনীনের ভাষণ থেকে উপকৃত হয়েছি।"তিনি বলেন যে, এই অনুষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো:

"শান্তি কেবল বিশ্বনেতাদের ওপর নির্ভর করতে পারে না; প্রত্যেক ব্যক্তিকেই নিজের সমাজ ও প্রভাবের পরিসরে ভূমিকা পালন করতে হবে।"

তিনি আরও বলেন: "বর্তমান কঠিন সময়ে এ ধরনের অনুষ্ঠান আশা, সাহস এবং ঐক্যের সঞ্চার করে। বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপচারিতা অত্যন্ত অনুপ্রেরণাদায়ক ছিল। অনুগ্রহ করে আপনাদের এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখুন-এটাই শান্তি প্রতিষ্ঠা করে।"

লিন্ডা স্টিফেন্স

তিনি "উইমেন'স ওয়েলবিয়িং' নামক একটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক এবং বিশেষভাবে নারীদের স্বাস্থ্য, মেনোপজ-পূর্ব ও পরবর্তী পরিচর্যা এবং মাতৃসেবা নিয়ে কাজ করেন। ভন জেমস ফার্মেসির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বুশরা তাঁকে এই অনুষ্ঠানে নিয়ে আসেন।

তিনি এর আগেও এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন: "এবারের অভিজ্ঞতা ছিল বিশেষভাবে ব্যতিক্রমধর্মী, কারণ আমি এখানে শান্তি, ভালোবাসা এবং পারস্পরিক সংযোগের যে অনুভূতি বিদ্যমান, তা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছি। এর সঙ্গে হযরত খলিফাতুল মসীহের ভাষণও অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিল।"

তিনি আরও বলেন: "বর্তমানে বিশ্ব সম্ভাব্য বৈশ্বিক যুদ্ধের হুমকির সম্মুখীন। তাই মানবতা, ঐক্য এবং শান্তির বার্তা আজ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।"

আহমদিয়া মুসলিম জামাআতের প্রশংসা করে তিনি বলেন:"এখানে ভালোবাসা, পারিবারিক মূল্যবোধ, বিভিন্ন ধর্মের প্রতি সম্মান এবং বৈশ্বিক ভ্রাতৃত্ববোধের একটি বাস্তব উদাহরণ দেখা যায়।" তিনি নিজেকে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পেরে সৌভাগ্যবান ও ধন্য মনে করেন।

ক্যাথরিন ক্লার্ক

হোয়াইট হিল ও বর্ডনের কাউন্সিল এবং অ্যালেক্স পেজ

সামাজিক ও জনসচেতনতামূলক কর্মী

তারা অনুষ্ঠানের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন: "ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত এ ধরনের অনুষ্ঠান স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি এবং ভালোবাসা ও পারস্পরিক সম্মান প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।"

তারা আরও বলেন: "বিভিন্ন পটভূমির মানুষের সঙ্গে একত্রে বসা এবং আলোচনা করার ফলে ভুল বোঝাবুঝি দূর হয় এবং একে অপরের শক্তি ও দুর্বলতা বোঝার সুযোগ সৃষ্টি হয়।"

তাদের মতে: "সংলাপ এবং পারস্পরিক সম্পর্ক বৈশ্বিক শান্তির জন্য অপরিহার্য। কারণ মানুষ যত বেশি একে অপরকে বুঝবে, সংঘাত তত কমে আসবে।"

উভয় অতিথিই হযরত খলিফাতুল মসীহের ভাষণকে অনুষ্ঠানের সবচেয়ে প্রভাবশালী অংশ হিসেবে উল্লেখ করেন।

কাউন্সিলর ক্যাথরিন ক্লার্ক আরও উল্লেখ করেন যে, তিনি হযরত খলিফাতুল মসীহের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করেছেন, যা তাঁর কাছে একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

জিল বার্স্টো

চার্চ অব জিসাস ক্রাইস্ট অব ল্যাটার-ডে সেইন্টস

কনভেনার, ইন্টারফেইথ মিল্টন কিন্স

তিনি বলেন: "হযরত আমীরুল মুমিনীনের ভাষণ অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিল। এটি স্পষ্ট ছিল যে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান রয়েছে এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত ব্যাপক।"

তিনি আরও বলেন: "যুদ্ধ, সংঘাত এবং শান্তির গুরুত্ব সম্পর্কে একজন ধর্মীয় নেতাকে এত সাহস ও সহমর্মিতার সঙ্গে কথা বলতে শুনে আমি অত্যন্ত অনুপ্রাণিত হয়েছি। এটি সত্যিই একটি আধ্যাত্মিকভাবে উন্নতকারী অনুষ্ঠান ছিল।"

সারা ডে

মেয়রেস, নিউপোর্ট প্যাগনেল

তিনি বলেন: "ভাষণের সময় আমি বারবার মাথা নাড়ছিলাম, কারণ প্রতিটি বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত ছিলাম। এটি আমাকে কয়েক বছর আগে হযরত আমীরুল মুমিনীনের একটি ভাষণের কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। আপনি দীর্ঘদিন ধরেই এসব বিষয় বলে আসছেন।"

তিনি আরও বলেন:"হযরত আমীরুল মুমিনীনের মহানতা হলো, তিনি কখনো বলেন না-'আমি তো আগেই তোমাদের সতর্ক করেছিলাম।' অথচ সত্য হলো, তিনি আমাদের সত্যিই সতর্ক করেছিলেন এবং আজও সতর্ক করছেন।"

তিনি বলেন:

"তিনি যা কিছু বলেছেন, তার অনেক কিছুই আজ আমাদের চোখের সামনে ঘটছে বা ঘটতে যাচ্ছে। এ বিষয়টি চিন্তা করলে ভয় লাগে, কিন্তু তাঁর ভাষণ ছিল অত্যন্ত কার্যকর ও গভীর প্রভাববিস্তারকারী।"

পরিশেষে বদর পত্রিকা হযরত আমীরুল মুমিনীন, খলিফাতুল মসীহ পঞ্চম (আই.) এবং জামাআতে আহমদিয়া যুক্তরাজ্যকে সফল শান্তি সিম্পোজিয়াম আয়োজনের জন্য আন্তরিক মোবারকবাদ জানায়।

একই সঙ্গে এই দোয়া করে যে, আল্লাহ তাআলা যেন বিশ্ববাসীকে হযরত আমীরুল মুমিনীনের মুবারক শান্তির আহ্বানের প্রতি মনোযোগী হওয়ার তাওফিক দান করেন এবং সমগ্র পৃথিবীকে শান্তি ও নিরাপত্তার আবাসভূমিতে পরিণত করেন।

(সৌজন্যে: আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৩ মে ২০২৬)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir